বাবুচোর

(অত্যদ্ভুত ডাকাতী রহস্য)

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

বসুমতী আফিস,

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ১১৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১২

বাবু চোর !

প্রথম কাণ্ড।

বাখরগঞ্জ জেলার একখানি গ্রাম। সেই গ্রামে সমস্তই ধান্যক্ষেত্র, ধারে ধারে একটু তফাতে কৃষক লোকের তৃণাচ্ছাদিত কুটীর। এক এক স্থানে পাঁচ সাত ঘর লোকের কুটীরপুঞ্জ। কোন লোকের বাড়ীতেই প্রাচীর ছিল না। বাহির হইতে ধানের গোলা, ধানের মরাই, খড়ের গাদা দৃষ্টিগোচর হইত। গ্রামে কোন প্রকার বৃক্ষ ছিল না, এক এক স্থানে এক একটা রোগা আমগাছ, বৃদ্ধ তেঁতুলগাছ দীর্ঘাঙ্গ কৃশ খেজুরগাছ আর এক একটা সেওড়াগাছ দাঁড়াইয়া ছিল; সকল গাছেরই পাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। এক একজন গৃহস্থের ঘরের পার্শ্বে দুই এক ঝাড় কলাগাছ ছিল, তাহার পাতাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। বৃক্ষের পরিচয় এই পর্য্যন্ত। চারিদিকেই মাঠ ধূ ধূ করিত। বৎসরের ধান কাটা হইয়া গেলে, সে সকল ক্ষেত্রে আর অন্য ফসল হইত না। গ্রামখানা আয়তনে খুব বড়—ভূগোলের পদ্ধতিতে পরিচয় দিতে হইলে বলা যাইতে পারে, সেই গ্রামের ভূভাগের পরিমাণফল চারি বর্গ-ক্রোশ। কৃষকদিগের ঘরগুলি ছাড়া সমস্তই ধান্যক্ষেত্র। ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে প্রায় এক বিঘা-পরিমিত উচ্চভূমি। সেই ভূমি

ওর উপর জমিদারের কাছারী-বাড়ী। সচরাচর পল্লীগ্রামের জমিদারী কাছারী যে রকম হয়, ঐ কাছারী-বাড়ী সে রকম ছিল না। চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ উচ্চ প্রাচীর, ভিতরে পাকা দালান দোতালা; চতুর্দ্দিকে চক্, একদিকে রন্ধনশালা, একদিকে দপ্তরখানা; দেউড়ীতে দরোয়ানদের থাকিবার ঘর; মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বৃহৎ বৃহৎ টালি দিয়া সেই প্রাঙ্গণটী বাঁধান হইয়াছিল। দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উপরের ঘরগুলিতে বৎসরের আট মাস চাবীবন্ধ থাকিত। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই চারি মাস জমিদার গিয়া উপরের ঘরে কাছারী করিতেন, তাঁহার সমভিব্যাহারী আমলাবর্গ, ভৃত্যবর্গ ও প্রহরিবর্গ দিনমানে উপরের ঘরেই কাজ করিত, রাত্রি দশটার পর নামিয়া আসিত। আমলাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, কেবল তাঁহারাই রাত্রিকালে উপরের ঘরে শয়ন করিতেন।

কাছারীবাড়ীখানি যেন একটী দ্বীপ। চতুর্দ্দিকে তৃণশূন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র;—দূর হইতে দেখায় যেন সমুদ্র! দিবা দ্বিপ্রহরের সূর্য্য-কিরণে দর্শকের নয়নে সেই কৃত্রিম সমুদ্রে যেন শরীরের তরঙ্গ-ক্রীড়া অনুভূত হইত।

প্রতি বৎসর পৌষমাসে এক এক জন জমিদার আসিয়া সেই কাছারী-বাড়ীতে বাস করেন; চৈত্রমাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া বৈশাখমাসের প্রথমে চলিয়া যান। যিনি যখন কর্ত্তা থাকেন, তিনিই স্বয়ং আসেন, কোন বিশেষ কারণে যে বৎসর আসিতে না পারেন, তাঁহার পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র সেই বৎসর আসিয়া কর্ত্তৃবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যান। ঐ চারি মাসে অনেক টাকা খাজনা আদায় হয়; অনেক টাকা নজর-সেলামী

পড়ে; বাবুদের বাড়ী অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে বাথট ধরা হইলে, তাহাও ঐ সময়ে আদায় হইয়া থাকে। কাছারী-বাড়ীতে অনেক টাকা জমা হয়। বাখরগঞ্জের সদর ষ্টেসন বরিশাল। বহুদিবসাবধি সকলেই জানিয়া আসিতেছেন; বরিশালের এলাকায় বদ্‌মাস লোক অসংখ্য; পুলিস্ তাহাদিগকে দমন করিতে পারে না। এক এক সময়ে পুলিসের দারোগা, মুন্সী, জমাদার ও বরকন্দাজেরা দস্যুহস্তে বিলক্ষণ প্রহার ভোগ করে, দুই একটা খালও হইয়া যায়। পুলিস ত পুলিস, ফৌজদারীর হাকিমেরা পর্য্যন্ত বরিশালের লোকের নামে ভয় পান। ইতিপূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে সর্ব্বদাই প্রায় ডাকাতী হইত। পুলিসের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে কতকটা কম হইয়াছে বটে, কিন্তু দুরন্ত লোকেরা আপনাদের বিক্রম দেখাইতে ক্ষান্ত হয় নাই।

ওয়াকোপ্ সাহেব যখন বর্দ্ধমান-বিভাগে ঠগী কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হন নাই, বঙ্গদেশে যখন ডিটেক্‌টিভ্ পুলিসের সৃষ্টি হয় নাই, বরিশাল তখন প্রায় অরাজক ছিল। ডাকাতেরা নির্ভয়ে গৃহস্থ-লোকের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত, পুলিসের সঙ্গে দাঙ্গা করিত, থানাবাড়ীতে আগুন দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিত, ফৌজদারী আদালতকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত, ডাকাত প্রায়ই ধরা পড়িত না। দূরে দূরে জঙ্গল, দিনমানেও সেই সকল জঙ্গলে লুকাইয়া, কবে কোথায় পড়িবে, তাহার পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিত। সে সকল দিন বড় ভয়ঙ্কর দিন ছিল। এই কাহিনীতে আমরা সেই সময়ের কথা বলিব।

চতুর্দ্দিকে সমুদ্রতুল্য মাঠ, মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় কাছারী-বাড়ী। ডাকাতেরা কাছারীবাড়ী লুঠ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বা

ভিতর চলিয়া যাইত; পরদিন প্রাতঃকালে পুলিসের লোকেরা কেবল রিপোর্ট লিখিয়াই তদারক সমাপ্ত করিতেন, ডাকাত ধরিবার চেষ্টা হইতেছে, রিপোর্টের শেষভাগে সেই কথা লেখা থাকিত। দিনের সঙ্গে, মাসের সঙ্গে, বৎসরের সঙ্গে, সেই সকল রিপোর্ট চোঁতা-কাগজের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িত। প্রতিবৎসর মাঘমাসে ঐ কাছারী-বাড়ীতে ডাকাতী হইত, হইতেই হয়. হইবেই হইবে, সকলেই ইহা জানিত; পুলিসেরও অজানা ছিল না। ডাকাতী যেমন হইবার, বার্ষিক নিয়মানুসারে ঠিক তেমনই হইত। আমাদের পূজা-পর্ব্বাদি উৎসবে এক একটী তিথি ধরা থাকে, কেবল কার্ত্তিকপূজায় আর চড়কে তিথি ধরা থাকে না, মাসের শেষ দিনেই কার্ত্তিকপূজা, মাসের শেষদিনেই চড়কপূজা, এই পদ্ধতি চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। বরিশালের ডাকাতেরা তিথিও ধরিত না, মাস ধরিয়া কাজ করিত। ঐ কাছারীতে মাঘমাসে ডাকাতী হইবে, এটী নিশ্চয় জানা ছিল। কিন্তু কোন্ দিনে হইবে, কাছারীর লোকেরা, গ্রামের লোকেরা অথবা পুলিসের লোকেরা কেহই তাহা জানিতে পারিত না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বড় বড় জাঁহাবাজ ডাকাতের দলপতিরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বড়মানুষের নামে চিঠি লিখিয়া ডাকাতী করিত, এ কথা শুনা হইয়াছে; কিন্তু বরিশালের ডাকাতেরা কোন বৎসর ঐ কাছারীতে অগ্রে চিঠি লিখিয়া ডাকাতী করিতে যাইত কি না, তাহা শুনা যায় নাই।

বৎসর বৎসর মাঘমাসে ডাকাতী হয়, জমিদারেরা সতর্ক হন নাই, ইহা শুনিলে, আপাততঃ আশ্চর্য্য মনে হয় বটে, কিন্তু জমিদারেরা সতর্ক হইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন ফল হয় নাই!

বাবু চোর !

যে সকল স্থান ধান্যপ্রধান, সেই সকল স্থানে জমিদার সরকারে মাঘমাসেই বেশী টাকা আদায় হয়; মাঘমাসেই ডাকাত পড়ে। পর পর কয় বৎসর দেখিয়া জমিদার এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে,মাঘমাসে প্রতিদিন যত টাকা আদায় হইবে, প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে উপযুক্ত পাইকপেয়াদা হেফাজতে তৎসমস্ত সদর-কাছারীতে ইরশাল করা হইবে। সে বন্দোবস্তেরও পরীক্ষা করা হইয়াছিল, ডাকাতেরা তাহাও বিফল করিয়া দিয়াছিল। মাঠের উপর দিয়া পথ, বনের ভিতর দিয়া পথ, খালের উপর দিয়া পথ, সুচতুর সন্ধানী ডাকাতেরা ঠিক ঠিক সন্ধিস্থলে ওৎ করিয়া থাকিত; লাঠিবাজী করিয়া, মল্লবেশে তরবারি ঘুরাইয়া আইন্দাগণকে ভূতলশায়ী করিত, সমস্ত টাকার তোড়া কাড়িয়া লইত।

একবৎসর মাঘমাসে উক্ত জমিদারী কাছারীর তিন ক্রোশ দূরে বৃহৎ এক আম্র-কাননে একদিন সন্ধ্যার পর বহুলোকের সমারোহ। হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে কত লোক কত দিকে ছুটিতেছে, কত লোক গাছে উঠিয়া ডালপালা ভাঙ্গিতেছে, কোন দিকে রন্ধন হইতেছে, কোন দিকে ছাগবলি হইতেছে, একধারে মণ্ডলাকারে মদের মজলীস্ বসিয়াছে, একধারে গাঁজার ধূমে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, উৎসাহের সীমা নাই।

বাগানের নিকট দিয়াই রাস্তা। রাস্তা দিয়া যে সকল লোক চলিয়া যাইতেছে, তাহারা দেখিয়া দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছে, "কোথাকার এত লোক এখানে বন-ভোজন করিতে আসিয়াছে ?" কেহ বলিতেছে,"বন-ভোজন নয়, বোধ হয়, বিদেশী লোক কোন তীর্থস্থানের ফেরত এইখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, আহারাদি করিয়া চলিয়া যাইবে!" কেহ বলিতেছে

"বোধ হয়, এই বাগানের মধ্যেই রাত কাটাইবে।" পান্থ লোকের পরস্পর এই প্রকার কথা। বাস্তবিক সেই সকল লোক কোথাকার, কাহারা তাহারা, কি বৃত্তান্ত, কেহই তাহার তথ্য জানিবার কষ্ট স্বীকার করিল না। যত লোক সেই পথ দিয়া গেল, সত্য তত্ত্বানুসন্ধানে সকলেই সেই প্রকার উদাসীন।

রাত্রি অগ্রসর হইতে লাগিল। লোকেরা আহারাদি করিয়া নানাপ্রকার পোষাক পরিধান করিল। কতকগুলি লোক হিন্দুস্থানী ধরণে চুড়িদার পায়জামা পরিয়া, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের চাপ্‌কান্ গায় দিয়া, মাথায় এক একটা পাগড়ী বাঁধিয়া, স্কন্ধে ও কটিদেশে তলোয়ার ঝুলাইয়া দ্বারবান্ সাজিল। কেহ কেহ বর্শাধারী হইল, প্রায় শতাধিক লোক ভদ্রলোকের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিল। একটী অল্পবয়স্ক যুবক বিবাহের বরের পোষাক পরিয়া, স্বর্ণহার কণ্ঠে দুলাইয়া, রত্নখচিত একটী বাঁকা তাজ মাথায় দিয়া, একখানা পাল্কীতে উঠিল। বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। কুড়ি জন বাদ্যকর;—ঢোল, কাঁড়া, টিকারা, জগঝম্প, কাঁসী, বাঁশী, শানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র।

কানন হইতে মিছিল বাহির হইল। অগ্রে অগ্রে দশজন মশালচী, পশ্চাতেও দশজন; রাত্রি প্রায় দশটা। মাঠের উপর দিয়া যাইতে হয়, মাঠের পথে গাড়ী চলে না, কাজে কাজেই সমস্ত লোক পদব্রজে চলিয়াছে; কেবল একখানি পাল্কী। পথে যাহারা যাইতেছিল, তাহারা সকলেই মনে করিল, বিবাহ করিতে বর যাইতেছে; কোথায় যাইবে, একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, উত্তর পাইয়াছিল, এই গ্রামের সীমা পার হইয়া বিলাসপুর গ্রামে।

আর কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। মশালচীগণের পশ্চাতে

পশ্চাতে জোরে জোরে বাদ্য বাজাইয়া বাদ্যকরেরা চলিয়াছে, মাঝে মাঝে রণবাদ্য বাজাইয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে, বরযাত্রিগণের মধ্যেও অনেকগুলি লোক এক একবার সঙ্গীতের সুরে হিন্দুস্থানী ভাষায় চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। সেই সকল চীৎকার যাহারা শ্রবণ করিল, তাহারা বুঝিয়া লইল, হিন্দুস্থানী বর।

যে কাছারী-বাড়ীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কাছারীবাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। কাছারী-বাড়ীর সম্মুখে পাল্কীখানা নামিল, বাদ্যভাণ্ড থামিল, লোকেরাও দাঁড়াইল। ভদ্র-পরিচ্ছদধারী দুইজন লোক কাছারীবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিসের বাদ্য হইতেছে, জানিবার জন্য কাছারীর জনকতক লোক সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিবাহের বর যাইতেছে জানিতে পারিয়া তাহারাও সেই সময় বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছিল। দপ্তর-খানায় প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকথিত লোকদুটী একজন স্থূলোদর অর্দ্ধবৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই কাছারীর নায়েব?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যথার্থই সেখানকার নায়েব। তিনি উত্তর করিলেন, "তাহাই আমি বটে, আপনারা কি চান?"

দুইজনের মধ্যে একজন একটু আড়ম্বর করিয়া বলিল, "আমরা বর লইয়া বিলাসপুরে বিবাহ দিতে যাইতেছি, বহুদূর হইতে আসিতেছি, এখানে আসিয়া শুনিলাম, এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে নিবিড় বন, সেই বন পার হইয়া বিলাসপুরে যাইতে হইবে, বনের ভিতর দিয়া পথ আছে, দিনমানে সেই পথে লোক

যাতায়াত করে, কিন্তু বনদস্যুর ভয়ে রাত্রিকালে প্রায় কেহই সে পথে চলে না; যদিও আমাদের সঙ্গে অনেক লোক, কিন্তু আমরা বিদেশী। যে সকল ডাকাত বনে বনে বেড়ায়, তাহারাও দলে পুরু, সহজেই ইহা অনুমান করা যায়। আমাদের সঙ্গে জনকতক দরোয়ান আছে, শোভা দেখাইতে তাহারা ভাল, কিন্তু ডাকাতের সম্মুখে যদি লড়াই করিতে হয়, সে কার্য্যে তাহারা পটু হইবে না; আপনাদের কাছারীতে পাকা পাকা খেলোয়াড় পাইক-পেয়াদা আছে, দয়া করিয়া জন আষ্টেক যদি এই রাত্রের জন্য আমাদের সঙ্গে দেন, বিশেষ উপকার হয়। আমরা তাহাদের যথোপযুক্ত পুরস্কার দিব। কন্যাবাড়ী পর্য্যন্ত যদি তাহারা যাইতে না পারে, জঙ্গলটা পার করিয়া দিয়া আসিলেও আমরা নিরাপদে যাইতে পারিব।"

নায়েব মহাশয় কহিলেন, "মালিক এখানে উপস্থিত না থাকিলে আমি এ কথার একটা উত্তর দিতে পারিতাম, মালিক এখন স্বয়ং এখানে আছেন, আপনারা উপরে যান, তাঁহাকে গিয়া বলুন, তিনি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন।" এই কথা বলিয়া নায়েব মহাশয় পার্শ্বের একজন চাকরের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

চাকর উপরতালার সিঁড়ির পথ দেখাইল, লোকদুটা উপরে গিয়া উঠিল। একটা সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে বাবু বসিয়া ছিলেন, পার্শ্বে দুইজন মুহুরী বসিয়া কাগজপত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছিল, লোকেরা নিকটে গিয়া বাবুকে নমস্কার করিল।

বাবুর নাম মহানন্দ মহাপাত্র। দিব্য চেহারা, গলদেশে সোণার শিকলে গাঁথা আট দশটী ছোট ছোট সোণার মাদুলী,

দুই হস্তের বাহুতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার দুইখানা ইষ্টকবচ। নূতন লোকদুটীকে দেখিয়া, উর্দ্ধমুখে চাহিয়া, বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন. "কে ? তোমরা কি চাও ?"

নায়েবকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, আগন্তুকেরা বাবুকেও সেই সকল কথা বলিল। বাবু তাহাদের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া নায়েবকে ডাকিতে বলিলেন। দ্বারের পার্শ্বে একজন আরদালী দাঁড়াইয়া ছিল, আদেশ-মাত্র সেই ব্যক্তি নামিয়া গিয়া নায়েবকে ডাকিল, নায়েব মহাশয় বাবুর কাছে আসিলেন। বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "এই দুটী লোক আটজন দরোয়ান চাহিতেছে, কি করা যায় ?" নায়েব মহাশয় বলিলেন, "আমি তাহা শুনিয়াছি, হুজুরের যেমন অনুমতি হয়, তাহাই করা যাইবে, এই কথা বলিয়াই আমি উহাদিগকে উপরে পাঠাইয়াছি।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেউড়ীতে এখন কজন দরোয়ান উপস্থিত আছে ?"

নায়েব উত্তর করিলেন, "পাইক, দরোয়ান সর্ব্বশুদ্ধ কুড়িজন ; তন্মধ্যে পাঁচজন অদ্য বৈকালে মফস্বলে গিয়াছে, পনরজন হাজির আছে।"

বাবু আবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দুটী লোকের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা আমার অপরিচিত, বিলাসপুরে বিবাহ দিতে যাইতেছ, বিলাসপুর আমার জমিদারী। কাহার কন্যার সহিত বিবাহ হইবে, তাহা জানিতে পারিলে আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিব।"

আগন্তুকেরা পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিয়া অতি অল্পক্ষণ

নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর একজন বলিল, "নামটী আমি ভুলিয়া যাইতেছি, বরকর্ত্তা বাহিরে আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে আমি জানাইব।" এই বলিয়া সেই লোক শীঘ্র শীঘ্র নামিয়া গেল, দশ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রতি-কান্ত গুড়।"

নায়েবের মুখপানে চাহিয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিলাস-পুরের রতিকান্ত গুড়কে আপনি জানেন ?"

নায়েব উত্তর করিলেন, "রতিকান্ত গুড় সেখানকার একজন মানী লোক ছিলেন, দুই বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পুত্র সদাশিব গুড় কোম্পানীর তরফে পশ্চিমদেশে চাকরী করেন, তাঁহার সহিত আমার দেখাশুনা নাই, কিন্তু তাঁহার পিতার সহিত আলাপ ছিল।"

একটু চিন্তা করিয়া বাবু বলিলেন, "ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ, বিশেষতঃ তাঁহারা আমার প্রজা, আপনি আটজন দরোয়ানকে ইহাদের সঙ্গে পাঠাইতে পারেন।"

আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ বলিল, "যাহারা তলোয়ার খেলিতে জানে, ডাকাতগণের সম্মুখে মহড়া দিতে পারে, সেই রকম—"

গম্ভীরবদনে বাবু বলিলেন, "হাঁ হাঁ, তাহাই হইবে ; ঘাসকাটা লোক তোমাদের সঙ্গে যাইবে না।"

নায়েবের সঙ্গে সেই দুটী লোক নামিয়া আসিল, নায়েবের হুকুমে আটজন দরোয়ান ঢাল-তলোয়ার লইয়া সজ্জিত হইল। আবার সমবেত বাদ্য বাজিয়া উঠিল, বর লইয়া বরযাত্রেরা বিলাস-পুরে চলিল। রাত্রি প্রায় ১১টা।

কাছারী-বাড়ীর লোকেরা আহারাদি করিয়া সদর-দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিল। আকাশে চন্দ্র ছিল, শুক্লপক্ষের নবমীর চন্দ্র, চন্দ্র অস্ত গেল। ইংরাজী হিসাবে রাত্রি প্রায় দেড়টা।

কাছারী-বাড়ীতে ডাকাত পড়িল। সদর-দরজা ভাঙ্গিয়া ডাকাতেরা প্রবেশ করিল না, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রে দুই জন বাড়ীর ভিতর আসিয়া সদর-দরজা খুলিয়া দিল, দরোয়ানেরা ঘুমাইতেছিল, ঝিন্ ঝিন্ শব্দে শতাধিক অস্ত্রধারী লোক বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, নিদ্রিত দ্বারবান্‌গণের হস্তপদ বন্ধন করিয়া সকলের মুখেই কাপড় বাঁধিয়া রাখিল, তাহার পর লুট-পাট আরম্ভ হইল। পিতল-কাঁসার বাসন অথবা বস্ত্রাদি লুণ্ঠন করা সে সকল ডাকাতের কার্য্য ছিল না, খাজনাখানায় আর বাবুর ঘরে নগদ টাকা জমা থাকে, তাহা তাহারা জানিত, মশাল জ্বালিয়া জ্বালিয়া সেই সকল ঘরের সিন্ধুক-বাক্স ভাঙ্গিয়া সমস্ত নগদ নগদ টাকা সংগ্রহ করিল। শব্দ পাইয়া যাহারা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদেরও হস্ত-পদ ও মুখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া এক ধারে ফেলিয়া রাখিল, খোঁটার সঙ্গে বাবুকেও বন্ধন করিল। মশা-লের আগুন কাহাকেও দগ্ধ করিল না, কাহারও অঙ্গে অস্ত্রাঘাতও করিল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে দুই চারিটা খুন-জখম হয়, সে বৎসর ডাকাতেরা কিছু কিছু সাধু হইল, খুন-জখম করিল না; লুটের মাল লইয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে গ্রামের সীমা পার হইয়া গেল।

সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, রজনী-প্রভাতে পুলিসের দল দিস্তা দিস্তা কাগজ লইয়া কাছারী-বাড়ীতে উপস্থিত হইল; ডাকাতেরা যাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া

দিল, কি কি জিনিস গিয়াছে, কত টাকা গিয়াছে, কোন্ কোন্ ঘরে ডাকাত ঢুকিয়াছিল, কে কে তাহাদিগকে দেখিয়াছে, ডাকাতের দলে কত লোক, তাহাদের হস্তে কি কি অস্ত্র ছিল, কাছারীর কোন লোক তাহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছে কি না, তাহাদের কাহারও মুখে মুখস পরা ছিল কি না, কোন্ পথ দিয়া তাহারা প্রবেশ করিয়াছিল, পুনঃ পুনঃ প্রত্যেককে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যে যতটুকু বলিতে পারিল, সে তাহাই বলিল, পুলিসের ক্ষিপ্রহস্ত মুহুরীরা নানা-প্রকার অলঙ্কার দিয়া সেই সকল কথা লিখিয়া লইল। অন্য জিনিস কিছুই যায় নাই, কেবল নগদ টাকাই ডাকাতেরা লইয়া গিয়াছে; তদারক ও অনুসন্ধানে তাহাই সপ্রমাণ হইল। তিনটী তহবিল; সরকারী তহবিল, নিজ তহবিল আর নায়েবের নিজ তহবিল। তিন তহবিলেরই খাতাপত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; খাজনার টাকা সর-কারী তহবিলের অন্তর্গত; নজর-সেলামী আর বাজে আদায় বাবুর তহবিলের অন্তর্গত; হিং, পাং, মাং ইত্যাদি সাঙ্কেতিক অঙ্কের টাকাগুলি নায়েবের তহবিলের অন্তর্গত; প্রত্যেক তহবি-লের খরচ বাদে সে রাত্রির কৈফিয়তে ভিন্ন ভিন্ন জমাখরচে যত টাকা জমা ছিল, তাহা একুন করিয়া দেখা হইল ৯৭৫৩ টাকা। পুলিসের রিপোর্টে সেইরূপ অঙ্কপাত হইল। এই পর্য্যন্তই তদন্ত সমাপ্ত হইয়া গেল।

পুলিসের লোকেরা এত পরিশ্রম করিল, তাহার জন্য তাহারা কি কিছু বক্সিস পাইবে না? অবশ্যই পাইবার অধিকারী। বাবুর কর্ণে সেই কথা উঠিলে, বাবু অঙ্গীকার করিলেন, ডাকাতের দল ধরা পড়িলে, কিম্বা দুই একটা ডাকাতের সন্ধান হইলে

পুলিসকে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন। কাছারী-বাড়ীতে সেদিন রজত-মুদ্রার অস্তিত্বও ছিল না, সুতরাং পুলিসের নগদ পূজার কোন-রূপে ব্যবস্থা হইতে পারিল না। দীর্ঘ দীর্ঘ রিপোর্ট লইয়া পুলিস বিদায় হইল, ডাকাতের সন্ধান হইবে, কিনারা হইবে, ইস্তাহার জারি হইবে, বাবুকে এই সকল কথা পুলিসের কর্তারা ভাল করিয়া জানাইয়া শুনাইয়া গেল। কিনারা হইবে কি না, সে কথা অনিশ্চিত—ভবিষ্যতের গর্ভে রহিল।

বলা কর্তব্য, কোন স্থানে যখন কোন বড়লোকের বাড়ীতে ডাকাতী হয়; প্রতিবাসী গরিবেরা তখন মহা ভয়ে ব্যস্ত হইয়া থাকে। এক এক স্থানে এমনও হয় যে, জাল গুটাইয়া ডাকাতেরা যখন বাহির হয়, তখন রাত্রি যদি একটু বেশী থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাসিগণের মধ্যে যাহাদের সংসার কিছু কিছু সৌষ্ঠব-সম্পন্ন, প্রস্থানকালে দলে দলে বিভক্ত হইয়া ডাকাতেরা সেই সকল প্রতিবাসীর বাটীতেও হাত বুলাইয়া যায়। যে গ্রামে এই কাছারী, সেই গ্রামেও যে তেমন কখনও হয় নাই কিম্বা হয় না, এমন যেন কেহ বিবেচনা না করেন।

বেলা ১১টা। যে আটজন দরোয়ান বরযাত্রীর সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল না। নায়েব মহাশয় মনে করিলেন, তাহারা হয় ত কন্যাকর্তার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে, বরযাত্রিগণের সঙ্গেই ফিরিবে। ক্রমশই বেলা অধিক হইতে লাগিল, কেহই ফিরিল না। বাবু সংবাদ পাইলেন, উদ্বেগের সঙ্গে তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল।

বেলা যখন প্রায় আড়াই প্রহর, সেই সময় চারিজন কাঠুরিয়া কাছারী-বাড়ীতে আসিয়া নায়েব মহাশয়কে বলিল, "বিলাসপুরে

জঙ্গলে নিত্য আমরা কাঠ কাটিতে যাই, আজ সকালেও গিয়াছিলাম, একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আসিলাম; আটটা গাছের সঙ্গে আটজন মানুষ বাঁধা। কাছে কাছে গাছ নয়, ৮।১০ হাত তফাতে তফাতে এক একটা গাছের গুঁড়িতে এক একটা মানুষ কাপড়ের সঙ্গে খুব শক্ত করিয়া বাঁধা আছে। মানুষেরা প্রায় উলঙ্গ, কেবল একটু একটু কপ্নী পরা। একজন মানুষকে আমরা চিনিতে পারিয়াছি; এই কাছারী-বাড়ীতে সেই মানুষকে আমরা দেখিয়াছি, তাহার নাম দ্বারিক সিং, এই কাছারীর দরোয়ান।"

নায়েব মহাশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কাঠুরিয়াদিগকে কাছারী-বাড়ীতেই আহার করাইয়া, বাবুকে কোন কথা না বলিয়াই, তিনি স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে সেই অরণ্যপথে যাত্রা করিলেন; চারিজন দরোয়ান আর দুইজন পাইক তাঁহার সঙ্গে রহিল।

বনে প্রবেশ করিয়া কাঠুরিয়াদের নির্দ্দেশমতে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষতলে নায়েব মহাশয় দেখিলেন, যথার্থ ই কাছারীর দরোয়ান। কি যে তখন তাঁহার মনে হইল, কাঠুরিয়ারা তাহা বুঝিতে পারিল না। একে একে আটজনের বন্ধন মোচন করিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এমন দশা কে করিয়াছিল?" দরোয়ানেরা যেরূপ উত্তর দিল, তাহা শুনিয়া নায়েব মহাশয়ের মনের সন্দেহ বহুগুণে বাড়িয়া উঠিল। দরোয়ানদের অঙ্গে বস্ত্র ছিল না, এক এক কৌপীন মাত্র সম্বল, সেই বেশেই তাহাদিগকে লইয়া বিলাসপুরগ্রামে গমন করিলেন, কাঠুরিয়ারাও সঙ্গে চলিল।

রতিকান্ত গুড়ের বাড়ী নায়েব মহাশয়ের জানা ছিল, সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মন তকিয়া গেল। দরোয়ান-বাধা সংবাদ পাইয়া অবধি এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা তিনি ভাবিতেছিলেন, তাহাই সত্য। গতরাত্রে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে বাড়ীতে তেমন চিহ্ন কিছুই দৃষ্ট হইল না। সদর-বাড়ীতে কেহই ছিল না; চণ্ডীমণ্ডপের একধারে একখানা লাল বনাত গায়ে দিয়া একজন লোক ঘুমাইতেছিল, ডাকাডাকি করিয়া নায়েব মহাশয় তাহাকে জাগাইলেন। চক্ষু মুছিতে মুছিতে সেই লোক উঠিয়া বসিয়া, নায়েব মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে একখানা সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া, নূতন লোকগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে তাড়াতাড়ি তামাক সাজিতে গেল; মনে মনে কি ভাবিল, অনুভবে হয় ত পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। সেই লোকটা গুড়ের বাড়ীর একজন পুরাতন চাকর, নাম নীলমণি।

নায়েব মহাশয় বসিলেন, একটু পরে নীলমণি ফিরিয়া আসিল। বামকক্ষে একটা পরিষ্কার তাকিয়া,দক্ষিণ হস্তে বৈঠকের উপর রূপা-বাঁধা হুঁকা। সতরঞ্চির উপর তাকিয়া রাখিয়া পার্শ্বে বৈঠক বসাইয়া, নীলমণি একটু তফাতে দাঁড়াইল; তাহার দৃষ্টি রহিল সেই সকল নূতন লোকের দিকে, কাঠুরিয়াদের দিকে যত না হউক্, দরোয়ানদের দিকেই সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত। সন্ন্যাসী নয়, মোটাসোটা বলবান্ হিন্দুস্থানী লোক অথচ এক এক কৌপীন পরিধান, ইহাই নীলমণির বিস্ময়ের কারণ।

হুঁকাতে কড়ি বাঁধা ছিল না, ব্রাহ্মণের বাড়ী, নায়েব মহাশয়ও ব্রাহ্মণ,তামাক খাইতে খাইতে নীলমণিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বাবুরা কোথায় ?" বাবুরা বাড়ীতে থাকেন না, নায়েব মহাশয় তাহা জানিতেন। কোন্ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নীলমণি উত্তর করিল, "আজ্ঞে, বড়বাবু পশ্চিমদেশে, ছোটবাবু ভশ্চাজ্জি-পাড়ায় তাস খেলিতে গিয়াছেন।"

নায়েব মহাশয় কহিলেন, "সংবাদ দাও, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিব, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

নীলমণি আর কোন কথা না বলিয়া ছোটবাবুকে ডাকিতে গেল। নায়েব মহাশয় তামাক খাইতে খাইতে পূর্ব্বাপর নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ;—পরে নীলমণির সঙ্গে ছোটবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোটবাবুর নাম শ্রীকান্ত গুড়, বয়স অনুমান একুশ বাইশ বৎসর। নায়েব মহাশয় পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখেন নাই, ছোটবাবুও তাঁহাকে চিনিতেন না, নীল-মণির মুখে শুনিয়াছিলেন জমীদারী কাছারীর নায়েব ; অতএব নায়েব মহাশয়কে নমস্কার করিয়া, সতরঞ্চির একধারে তিনি বসিলেন।

নায়েব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সদাশয় বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ? শ্রীকান্ত কহিলেন, "আজ্ঞে না ; তিনি আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র।" নায়েব মহাশয় পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আপনার পিতা কোথায় ?" শ্রীকান্ত কহিলেন, "আজ্ঞে, তিনি স্বর্গগত। দাদাই এখন আমাদের সংসারের কর্ত্তা, বিষয়কার্য্যের অনুরোধে তিনি পশ্চিমদেশে থাকেন, আমিই সংসারের কাজকর্ম্ম দেখি।"

একটু চিন্তা করিয়া, নায়েব মহাশয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "আপনাদের বাড়ীতে কি অবিবাহিতা কন্যা আছেন ?" শ্রীকান্ত উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, দাদার কন্যা হয় নাই, তাঁহারও সহোদরা ভগ্নী নাই, আমারও ভগ্নী নাই।"

পুনরায় কি চিন্তা করিয়া নায়েব মহাশয় কহিলেন, "আপনি শীঘ্র বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করুন, আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে কাছারীতে যাইতে হইবে।"

শ্রীকান্ত ভাবিলেন, কাছারীতে যাইতে হইবে, হঠাৎ এমন কি আবশ্যক উপস্থিত ? আমাদের জমিজমা সম্বন্ধে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে না কি ? ভাবিলেন এইরূপ, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, নায়েব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি পদব্রজে আসিয়াছেন ?" নায়েব মহাশয় কহিলেন, "কাজে কাজেই আসিতে হইয়াছে, জরুর দরকার।"

শ্রীকান্ত বলিলেন, "একটু বসুন, আমি একখানা গাড়ী আনাইতে বলি।"

জানা উচিত, সে অঞ্চলে মাঠের পথে ও বন-পথে ঘোড়ার গাড়ী চলে না ; নায়েব মহাশয় বলিলেন, "না, গাড়ী আবশ্যক নাই, গরুর গাড়ী আবশ্যক নাই, গরুড় গাড়ীতে যাইতে অনেকটা বিলম্ব হইবে, রৌদ্র কমিয়া আসিয়াছে, পদব্রজে যাওয়াই ভাল, আপনি শীঘ্র কাপড় ছাড়িয়া আসুন।"

শ্রীকান্ত বাড়ীর ভিতর গেলেন, বসন পরিবর্ত্তন করিয়া অবিলম্বেই বাহিরে আসিলেন। নায়েব মহাশয় উঠিলেন, অগ্রে অগ্রে চলিলেন, শ্রীকান্ত অনুগামী হইলেন। নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে কাছারী-বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলেন।

বাবু সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন, বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য দরোয়ানগণের বাচনিক এজাহার শ্রবণ করা আবশ্যক হইল, থানার দারোগার সম্মুখেই শ্রবণ করিলে ভাল হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ পত্র লিখিয়া একজন পদাতিককে থানায় প্রেরণ করা হইল। থানা সে স্থান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূর। রাত্রি প্রায় আটটার সময় দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভূমিকা-প্রসঙ্গে যাহা যাহা বলিতে হয়, দারোগাকে তাহা বলিয়া দরোয়ানগণের কথা শুনিবার জন্য জমিদার মহাশয় তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। যে ব্যক্তি দরোয়ানের সর্দ্দার অর্থাৎ জমাদার, সেই ব্যক্তি বলিতে লাগিল, "বরযাত্রিগণের সহিত আমরা যখন বনপথের মাঝামাঝি গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেই সময় সেই দলের একটী লোক আমাদের সহিত দিব্য সদালাপ করিতে লাগিল, আমরা খুব ভাল খেলোয়াড়, এই কথা বলিয়া আমাদের প্রশংসা করিতে লাগিল, প্রশংসার কারণ আমরা তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রশংসা করিতে করিতে সেই লোক আমাদিগকে বলিল, 'এই বনে বিস্তর ডাকাতের দল থাকে, তাহা তোমরা জান, আমরা নূতন লোক, কিছুই জানি না, রাত্রি গভীর হইয়াছে, এই সময় ডাকাতের দল যদি আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, কিরূপ বীরত্ব দেখাইয়া তোমরা তাহাদিগকে ভাগাইবে, আমাদের কাছে একটু পরীক্ষা দেখাও; কেমন তোমরা তলোয়ার খেলিতে জান, একবার খেলাও।' সে লোকের মৎলব আমরা বুঝিতে পারিলাম না, অল্পক্ষণ তলোয়ার ঘুরাইয়া খেলা দেখাইলাম। তখন তাহাদের দশমুখে বাহবা পড়িতে লাগিল, একজন বলিল, 'এমন শিক্ষা না হইলে তোমরা কি অত বড় একটা

জমিদারী রক্ষা করিতে পারিতে? বরিশাল জেলায় তোমাদের মতন খেলোয়াড় না হইলে জমিদারী কাছারী রক্ষা করিতে পারে না; আমরা তোমাদের কাছে খেলা শিখিব। তোমাদের অস্ত্রগুলি একবার আমাদের হাতে দাও, আমরা ঘুরাই, তোমরা শিখাইয়া দাও, আমাদের সঙ্গে যে সকল দরোয়ান আছে, তাহারাও শিখুক।' অতশত আমরা কি বুঝি, ভালমানুষের মতন সাজ, ভালমানুষের মতন কথা, বিবাহের বরযাত্র, বেশ বেশ বাবুলোক, আমাদের আটজনের আটখানি তলোয়ার তাহাদের আটজনের হাতে আমরা দিলাম; ঢাল দিতে চাহিলাম, তাহা তাঁহারা লইল না, কেবল তলোয়ার লইয়া ঘূরাইতে লাগিল। সেই দিকে মন রাখিয়া, সেই দিকে চক্ষু রাখিয়া, আমরা কেবল তাহাই দেখিতে লাগিলাম। সেই সময় তাহাদের দলের অনেক লোক আমাদের পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়া আসিয়া আমাদের আটজনকেই বাঁধিয়া ফেলিল, আমরা অনেক টানাটানি করিলাম, তাহাদের হস্তবন্ধন ছাড়াইতে পারিলাম না। হুড়াহুড়ি করিয়া আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, সেই সময় তাহারা আমাদের ঢালগুলি কাড়িয়া লইল, কাপড় কাড়িয়া লইয়া উলঙ্গ করিল, শেষকালে এক এক কপ্নী পরাইয়া এক একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। সেই সময় তাহাদের বাদ্যকরেরা নাচিয়া নাচিয়া মাথা ঘূরাইয়া খুব জোরে জোরে কি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিল। তাহাদের হাস্য-কোলাহলে বন যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, বিবাহ নয়, বরযাত্র নয়, দুর্জ্জয় ডাকাত। আমাদের আটজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহারা আবার এই দিকেই ফিরিয়া আসিল।"

পুলিসের লোকেরা কোন একটা হাঙ্গামার সময় যাহার মুখে

যাহা কিছু আকর্ণন করেন, তৎসমস্তই লিখিয়া লিখিয়া লন। থানার দারোগা মহাশয় বাবুর দরোয়ানের ঐ সকল কথা লিখিয়া লইলেন। তাহার পর নায়েব মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন, "বর-যাত্রী সাজিয়া যাহারা এই পথ দিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন এই কাছারীতে আসিয়া বলিয়াছিল, বিলাসপুরের রতি-কান্ত গুড়ের বাড়ীতে বিবাহ দিতে যাইতেছে, তাহারাই আমা-দের আটজন দরোয়ানকে এখান হইতে চাহিয়া লইয়া গিয়াছিল। বেশীরাত্রে কাছারীতে ডাকাত পড়িয়াছিল, তাহা আপনি জানেন, প্রভাতে আপনি তদারক করিয়া চলিয়া যাইবার পর বৈকালে কাঠুরিয়াদের মুখে সংবাদ পাইয়া, দরোয়ানগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আমি বিলাসপুরে গিয়াছিলাম। রতিকান্ত গুড়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এই শ্রীকান্ত গুড়কে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি; ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, জানিতে পারিবেন, বিবাহের কথাটা কাণ্ডই মিথ্যা। ইঁহা-দের বাড়ীতে একটীও অবিবাহিতা কুমারী নাই।"

বাবু শ্রীকান্ত গুড় নায়েব মহাশয়ের বাক্যে প্রতিধ্বনি করি-লেন, দারোগা মহাশয় সেই সকল কথাও লিখিয়া লইলেন। তিনি একাকী আইসেন নাই, তাঁহার সঙ্গে একজন মুন্সী আর পাঁচজন বরকন্দাজ আসিয়াছিল, অধিক রাত্রে তাহাদের সঙ্গে তিনি থানায় ফিরিয়া গেলেন। শ্রীকান্ত গুড় তত রাত্রে বাড়ী যাইতে পারিলেন না, আহারাদি করিয়া কাছারী-বাড়ীতেই নিশা-যাপন করিলেন। কাঠুরিয়ারাও কাছারী-বাড়ীতে রাত্রিবাস করিল, রজনীপ্রভাতে বাবুর নিকট হইতে বক্সিস লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। বলা আবশ্যক, তাহারাও ঐ জমিদারের প্রজা।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

এমন ধারাবাহিক নিয়মিত বার্ষিক ডাকাতী বরিশাল ভিন্ন বঙ্গদেশের আর কোথাও হইত কি না, ওয়াকোপ সাহেব হয় ত তাহা অবগত হইয়া থাকিবেন। এ দেশের অপর লোকেরা তাহা অবগত আছে কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না। চিঠি লিখিয়া, পাল্কী চড়িয়া অনেক ডাকাত অনেক জায়গায় ডাকাতী করিয়াছে, প্রাচীন লোকের মুখে তাহা আমরা শুনিয়াছি। বিবাহের বর সাজাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, ডাকাতেরা ডাকাতী করে, এমন ভয়ঙ্কর কথা আমরা আর কোথাও শুনি নাই। যে বৎসর বরিশালের জমিদারী কাছারীতে এইরূপ ডাকাতী হয়, সেই বৎসর চৈত্রমাসের শেষে একজন ঘোড়সওয়ার ঐ কাছারীতে উপস্থিত হইয়া বাবু মহানন্দ মহাপাত্রকে বলে, "বঙ্গদেশে একটা প্রবাদ আছে, 'বর না চোর,' আপনার কাছারীতে যেরূপ ডাকাতী হইয়া গেল, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিয়াছি, সেই প্রবাদটা ছোট, 'বর না ডাকাত' এই প্রবাদটাই বড় হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের হৃদয় কাঁপাইবে। কিন্তু মহাদেবের নাম স্মরণ করিয়া আমি আশা করিতেছি, এ প্রকার ডাকাতী আপনার কাছারীতে এই পর্য্যন্তই শেষ হইবে। আগামী বৎসর মাঘমাসের প্রথমে কিম্বা পৌষমাসের শেষে আমি এইখানে পুনরায় উপস্থিত হইব। ডাকাতী যদি হয়, বর হইয়াই আসুক, চোর হইয়াই আসুক, রাজা

হইয়াই আসুক কিম্বা অসুর হইয়াই আসুক, আমি তাহা-দিগকে ধরিব। এই এক বৎসরের মধ্যে আপনারা দেখুন, কোম্পানী বাহাদুরের তক্‌মাধারী পুলিসের দূতেরা কতদূর কৃত-কার্য্য হইতে পারেন। আমাকে আপনারা এখন চিনিতে পারি-বেন না, নিজেও আমি এখন আত্মপরিচয় প্রকাশ করিব না, কেবল এইটুকু মাত্র জানিয়া রাখুন, আমি সিংহলবাসী নহি, ব্রহ্মবাসী নহি, পঞ্জাববাসী নহি, সমুদ্রপারের অন্য কোন প্রদেশ-বাসী নহি, আমি একজন সামান্য বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ।"

ঘোড়সওয়ারের আকার প্রায় চারি হস্ত দীর্ঘ, দিব্য হৃষ্টপুষ্ট দেহ, বদনমণ্ডল তেজস্বিতা-পূর্ণ, চক্ষু আকর্ণ-বিস্তৃত, উভয় কর্ণ-মূলে কৃষ্ণবর্ণ গালপাট্টা, মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের উপর সুবর্ণ-খচিত উষ্ণীষ, অঙ্গাবরণের উপর স্কন্ধদেশে স্বর্ণখচিত ঝাঁপ্পা, হস্তে একখানি কোষমুক্ত সুশাণিত সমুজ্জ্বল তরবারি। পরম সুন্দর বীরপুরুষ। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর।

বাবু মহানন্দ মহাপাত্রকে ঐ কথাগুলি বলিয়াই সেই ঝাঁপ্পা-ধারী ঘোড়সওয়ার একলম্ফে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নক্ষত্র-গতিতে ক্ষেত্রভূমি পার হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বাবু মহানন্দ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, অবসর হইল না। কাছারীর খাতাঞ্জী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেই সওয়ারের মুখপানে চাহিয়া ছিলেন, সওয়ার প্রস্থান করিবার পর বাবুকে তিনি বলিলেন, "ঐ মূর্ত্তি বর্দ্ধমানের মহারাজের এক দেবালয়ে আমি একবার দর্শন করিয়াছিলাম।" বাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, যাহার আপাদমস্তক বিবিধ বর্ণের বস্ত্রে সমাবৃত, তাহাকে চিনিয়া রাখা আশ্চর্য্য ক্ষমতার কার্য্য।"

মাঘমাস ফুরাইয়া গেল, এলাকার পুলিস কিছুই করিতে পারিলেন না; ফাল্গুনমাস গেল, কোন খবর নাই; চৈত্রমাসের শেষে আশ্চর্য্য সওয়ারের অধিষ্ঠান, তখনও পর্য্যন্ত পুলিসের কোন সন্ধান নাই। বরিশাল জেলার চড়কপার্ব্বণে অনেক স্থলে মহা সমারোহ হয়। এক একজন জমিদারের নিজের এক একটী গাজন আছে, সেই সকল গাজনে নানা শ্রেণীর বহুলোক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। গাজনের সন্ন্যাসীরা কেবল সং সাজিতে পারে, জয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া নৃত্য করিতে পারে, উপবাসের নামে শিবকে ফাঁকি দিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইতে পারে, এরূপ মনে করা ভুল। গাজনের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে অনেক সঙসাজা সন্ন্যাসী মল্লবেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে, লাঠি খেলিতে পারে, তলোয়ার খেলিতে পারে, বিশ পঁচিশ হাত উচ্চ প্রাচীর লাফ দিয়া লঙ্ঘন করিতে পারে, এরূপ অনেক শুনা হইয়াছে। বরিশালের এক একটী গাজনে সন্ন্যাসিদলে অনেক ডাকাত থাকে, এ কথাও লোকে বলে। গাজনের সময় কোন কোন স্থলে ধনবান্ লোকের বাড়ীতে ডাকাতী হয়, ডাকাত ধরা পড়ে না, কিন্তু এক একজন বাড়ীওয়ালা আপন গৃহে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া মশালের আগুনে দগ্ধ হইতে হইতে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছেন, এক একজন ডাকাতের গলদেশে গুচ্ছ গুচ্ছ সুরঞ্জিত সন্ন্যাস-সূত্র। মহানন্দবাবুর জমিদারী কাছারীর অতি নিকটে একটা গাজন হয়। শিবের মন্দির নাই, গাজনের এক পক্ষ পূর্ব্ব হইতে সন্ন্যাসীরা একটা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর মাটীর শিবলিঙ্গ বসায়। চড়কে পিটফোড়া-বাণফোড়া-নিষেধের আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে ঐ গাজনে,

ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক ক্রীড়া হইত। এক একজন জমিদার কয়েকদিনের জন্য সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া প্রহরাধিককাল শিবতলায় অবস্থান করিতেন। মহা-সমারোহ, মহা জনতা, মহা গণ্ডগোল, তদুপলক্ষে খুন-জখম, হওয়াও অসম্ভব নহে ভাবিয়া জমিদারের অনুরোধে শান্তিরক্ষকেরা তথায় উপস্থিত থাকিতেন; এখনও বহুজনাকীর্ণ মেলাস্থলে শান্তিরক্ষকের উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। যে বৎসরের বৃত্তান্ত, সে বৎসরের চড়ক-পার্ব্বণ সমাপ্ত হইবার তিন দিন পরে নূতন বৎসরের চতুর্থ দিবসে বাবু মহানন্দ মহাপাত্র কাছারীবাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ ভবনে যাত্রা করিলেন। ডাকাতীর তদন্ত পুলিসের হস্তে রহিল। পুলিস কখন্ নিদ্রা যান, কখন্ জাগরণ করেন, কখন্ তদন্তে বাহির হন, কাছারী-বাড়ীর কর্ম্মচারীরা সে সকল খবর রাখেন না;—রাখিবার চেষ্টাও করেন না।

তৃতীয় কাণ্ড।

যশোহর ও চব্বিশ পরগণার স্বনামখ্যাত সুবিস্তৃত অরণ্য যেমন সুন্দরবন, দিনাজপুর জেলায় সীমাপ্রান্তে সেইরূপ এক পুরাতন মহারণ্য। কত কাল ধরিয়া সেই বন সমভাবে রহিয়াছে, কত শত পুরাতন বৃক্ষ সেই বনে দীর্ঘ দীর্ঘ শিকড় গাড়িয়া বড় বড় রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতেছে, সকল বৃক্ষের নাম কি, স্থানীয় লোকেরা কেহই তাহা বলিতে পারে না। বহুদূর পর্য্যন্ত সেই বনের সীমা। দিনাজপুরের মহীপালদীঘী যেমন সুপ্রসিদ্ধ,

ঐ মহারণ্যও সেইরূপ। সেখানকার প্রাচীন লোকেরা গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন, ঐ বনের নাম মহীপাল-কানন। সুন্দর-বনের বহুস্থান অধুনা আবাদ হইয়াছে, মহীপাল-কাননের কোন স্থান আবাদ হয় নাই, সময়ে সময়ে কাষ্ঠজীবীরা দুই একটা বৃক্ষ কর্ত্তন করে, তাহাতে বনের নিবিড়তা কমে না, বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করে। বনে অনেক প্রকার হিংস্রজন্তু বাস করিয়া থাকে; বনমধ্যে মনুষ্য প্রবেশ করিলে, সেই সকল জন্তু দূরে দূরে সরিয়া যায়, রাত্রিকালে সমস্ত বন তোল্‌পাড় করিয়া বেড়ায়। জনশ্রুতি এইরূপ যে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা রজনীতে সেই বনে প্রতিমার আরতির বাদ্যের ন্যায় শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্যধ্বনি হয়, কাহারা বাজায়, কেহ তাহা জানে না; বনে অনেক বনদেবতা থাকেন, ভারতের অনেক স্থানে এরূপ প্রবাদ; প্রতিমা থাকা অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু গভীর-রজনীতে কেহ সেই সকল প্রতিমার পূজা করিতে যায় কিম্বা বাদ্যধ্বনি করিয়া আরতি করে, ইহা সকলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করেন না।

বরিশালের জমিদারী কাছারীর ডাকাতীর পর আট মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, পরবৎসরের শরৎকাল। আশ্বিনমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতিক্রান্ত; শারদীয়া মহাপূজা নিকটবর্ত্তিনী; দুর্গোৎসবের মহোল্লাসে সমস্ত হিন্দুগৃহ উল্লাসিত। দিনাজপুরের মহীপাল-কাননে একটী লোক। পরিধান শুভ্র বসন, গাত্রে গৈরিক-রেণু-বিলেপন, ললাটে ও মুখমণ্ডলে গৈরিকবর্ণের অক্ষরে শিবনাম অঙ্কিত, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘজটা, নাভিস্থল পর্য্যন্ত শুভ্র শ্মশ্রু বিলম্বিত, শুভ্রবর্ণ লোমে ওষ্ঠাধর প্রায় আচ্ছন্ন

স্থিত, গলদেশে রুদ্রাক্ষমাল্য, এক হস্তে ত্রিশূল, একহস্তে বন্দুক; চরণদ্বয় পাদুকাশূন্য।

কে এই লোক, অনুমান করা কঠিন। জটাবিভূতি দর্শনে শৈব সন্ন্যাসী বোধ হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীর হস্তে বন্দুক থাকে, এটাই বা কি? বনে তখন অন্য লোক ছিল না, থাকিলেও কেহ সেই লোকটাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিতে পারিত না, আমরাও তাহাকে সন্ন্যাসী বলিতে পারিব না। ছদ্মবেশী শীকারী, মূর্ত্তি দর্শনে আপাততঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। মস্তকে জটাভার, সেই লক্ষণে জটাধারী বলিয়া পরিচয় দেওয়াই ঠিক। জটাধারী বনপথে পরিভ্রমণ করিতেছে, এক একবার এক একটী তরুগাত্রে অঙ্গ রাখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে। নিবিড় তরু-পল্লব ভেদ করিয়া অল্প অল্প সূর্য্যরশ্মি বনস্থলে প্রবেশ করিতে-ছিল। রশ্মি প্রায় স্বর্ণবর্ণ। সূর্য্যদেব অস্তাচল-শিখরে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, জটাধারী বার বার আকাশপানে চাহিয়া চাহিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকে নমস্কার করিতেছিল; সন্ধ্যা সমাগত হইলে লোকালয়ে প্রবেশ করিবে কিম্বা বনমধ্যেই নিশাযাপন করিবে, জটাধারীর মুখ দেখিয়া তাহা অনুমান করিতে পারা গেল না। বিশাল অরণ্যমধ্যে নিশাসমাগমে অনেক প্রকার উপদ্রব হয়, হিংস্রজন্তুর আক্রমণের ভয় থাকে, কিন্তু জটাধারীর বদনে ভয়ের কোনরূপ লক্ষণ ছিল না. বদন-মণ্ডল প্রশান্ত। সুদীর্ঘ কৃষ্ণনেত্র ক্ষণে ক্ষণে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিল; সেই চক্ষু তখন কি দেখিতেছিল, তাহাও জানা গেল না।

বনের যে অংশে জটাধারী, সে অংশ হইতে লোকালয় প্রায় দুই ক্রোশ দূর। লোকালয়ে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা থাকিলে,

তাহার গতি অন্যদিকে ফিরিত, তাহা ফিরিল না; যে দিকে গভীর বন, জটাধারী সেই দিকেই মন্থরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আর সূর্য্য দেখা যায় না, অস্তাচলে অদৃশ্য হইবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকিলেও বনভূমি অন্ধকার হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী চলিতেছে, গতির বিরাম নাই; বামে দক্ষিণে অথবা পশ্চাতে কোন দিকেই দৃষ্টি নাই।

যে স্থানে কিছু পূর্ব্বে সন্ন্যাসীকে দেখা গিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সে স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ অগ্রসর হইয়া সে একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন আর কিছুই দেখা যায় না; চতুর্দ্দিক্ হইতে অন্ধকার আসিয়া বনস্থলীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

জটাধারী তখন যায় কোথায়? কেই বা জিজ্ঞাসা করে, কেই বা উত্তর দেয়? সরাসর পূর্ব্বমুখে আরও খানিকদূর চলিয়া গিয়া জটাধারী একটা আলো দেখিতে পাইল; আলোকরশ্মি নিকট হইতে আসিতেছে, এমন বোধ হইল না, দূর হইতে দূরের আলো যেমন দেখা যায়, ঠিক সেই প্রকার। রশ্মি চঞ্চলা, এক একবার বাতাসে কাঁপিতেছে, এক একবার স্থির হইতেছে, এক একবার যেন নিবিয়া যাইতেছে, আবার উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

জটাধারী ভাবিল, কিসের আলো? নিবিড় বনে লোকালয় থাকা অসম্ভব, কে তবে ঐরূপ আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছে? ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না, সাহসে ভর করিয়া সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিল; যতদূর যায়, আলো যেন ততদূর চলিয়া চলিয়া যায়। কেহ কি তবে

আলো জালিয়া বনপথে ভ্রমণ করিতেছে? জটাধারী একবার এইরূপ ভাবিল; আবার ভাবিল, হয় ত দৃষ্টির বিভ্রম। যেখানকার আলো সেইখানেই আছে, দৃষ্টির ভ্রমে বোধ হইতেছে যেন চলিতেছে। দুই হস্তে নেত্রমার্জ্জন করিয়া, আবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, অনুমান যথার্থ, দৃষ্টিরই ভ্রম হইতেছিল, আলো চলিতেছে না, একস্থানেই ঠিক রহিয়াছে। প্রায় অৰ্দ্ধ ক্রোশ চলিয়া গিয়া জটাধারী সম্মুখে দেখিল, বৃহৎ এক মন্দির, দীর্ঘে প্রায় শত হস্ত, প্রস্থেও প্রায় শত হস্ত, ঊর্দ্ধে অনুমান চারিশত হস্ত; মন্দিরের দ্বার অনাবৃত; মন্দিরমধ্যেই আলো জলিতেছিল, মশালের আলো। মন্দিরের বারাণ্ডায় উঠিবামাত্র জটাধারী অনুমানে বুঝিল, দুইজন শ্মশ্রুধারী লোক মন্দিরের ভিতর ছুটিয়া ছুটিয়া একদিকে লুকাইয়া গেল।

মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া চঞ্চল-নয়নে জটাধারী চারিধারে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই, মধ্যস্থলে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড এক মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি; গুমো ভূতের উপর সেই মূর্ত্তি উপবিষ্ট। গুমোটা বৃষভের ন্যায় চতুষ্পদে দণ্ডায়মান, কৃষ্ণপ্রস্তরে গঠিত, বৃষের ন্যায় শৃঙ্গবিশিষ্ট, গোমুখ; মুখখানা দেখিলেই ভয় হয়।

মহাদেব পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র, দশভুজ। দশহস্তে পিনাক, ডমরু, শিঙ্গা, ত্রিশূল, শঙ্খ, সর্প প্রভৃতি দশবিধ ভূষণ ও প্রহরণ; মস্তকে সর্প, উভয় স্কন্ধে সর্প, গলদেশে সর্পের উপবীত, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। অস্ত্র, বস্ত্র, সর্প সমস্তই প্রস্তরনির্ম্মিত।

শিবের মন্দির, শিবের প্রতিমা, কিন্তু শিবের পূজা হয় না; মন্দির দিব্য পরিষ্কার, কোনদিকে শুষ্ক বিল্বপত্র অথবা শুষ্ক পুষ্পের

চিহ্নমাত্র নাই। শিবের পূজা হয় না, কিন্তু রাত্রিকালে আলো জ্বলে, আশ্চর্য্য মশাল জ্বলিতেছে, মশালের আলোতে একপ্রকার সুগন্ধ বাহির হইতেছে। সেই আলোক-দীপ্তিতে শিবমূর্ত্তি বড় সুন্দর দেখাইতেছে। জটাধারী ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল; আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া চক্ষু মুদিয়া মহাদেবের স্তব পাঠ করিল, আবার নয়ন উন্মীলন করিয়া মন্দিরের চারিধারে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই, ইতিপূর্ব্বে দুইজন লোক দ্রুতপদে একদিকে লুকাইয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? জটাধারী ভাবিল, সেটাও হয় ত তাহার কল্পনা; মহাদেবের সঙ্গে ভূত-প্রেত থাকে, পৌরাণিক কথা; কল্পনায় ভূত-প্রেত দেখা যায়; যাহারা লুকাইয়াছিল, তাহারা হয় ত কল্পনার চক্ষেই দৃষ্ট হইয়াছিল, বস্তুতঃ কিছুই নহে, ইহাই জটাধারীর তখনকার সিদ্ধান্ত।

রাত্রি অনুমান দশ দণ্ড। মহালয়া অমাবস্যার পূর্ব্বে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী; রাত্রি দশ দণ্ড গতে চন্দ্রোদয় হইল। তাদৃশ তরুপল্লবাবৃত অরণ্যমধ্যে সূর্য্যকিরণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারে না, চন্দ্রকিরণ অতি অল্পই প্রতিফলিত হয়। ঘোরতিমিরাবৃত রজনী যে প্রকার, চন্দ্রোদয়ে তেমন অন্ধকার রহিল না, মশালের আলোও বাহিরে অনেকদূর পর্য্যন্ত আসিতেছিল. মন্দির হইতে বাহির হইয়া জটাধারী ঊর্দ্ধনেত্রে তলভাগ অবধি মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিল। প্রকাণ্ড মন্দির, কতকাল পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছে, গঠন দেখিয়া তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মন্দিরের মাথার উপর বটাশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া নিম্নদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত শিকড় নামাইয়া দিয়াছে, কিন্তু মন্দিরগাত্রে কোথাও

একটুমাত্র চিড় ধরে নাই, চুণ-বালিও খসে নাই, কেবল বৃষ্টির জলে উপরিভাগ ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে মাত্র; অভ্যন্তরে পরিষ্কার পথের কাজ অব্যাহত রহিয়াছে; নিকটে দাঁড়াইয়া অবলোকন করিলে সেই দেয়ালদর্পণে মানুষের মুখ দেখা যায়, এত পরিষ্কার, এত স্বচ্ছ।

জটাধারী তখন আমাদের দেশের প্রাচীন স্থপতিকার্য্য আলোচনা করিতে লাগিল। বনমধ্যে মন্দির, বহুকালের মন্দির, কত ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প এই মন্দিরের উপর দিয়া গিয়াছে, কিছুমাত্র হানি করিতে পারে নাই। গাঁথুনির পারিপাট্য এত সুন্দর যে, বাহির হইতে একখানি ইষ্টক পর্য্যন্ত দেখা যায় না। অধুনা পাশ্চাত্য জগৎ হইতে যে সকল বড় বড় স্থপতি আসিতেছেন, এদেশে তাঁহারা যে সকল বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন, দশ বৎসর পার হইতে না হইতেই সেই সকল অট্টালিকার পুনঃ সংস্কার আবশ্যক হইতেছে, এমন কি, এক একটা অট্টালিকা সমূলে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইতেছে, ভারতের রাজধানীর নূতন হাইকোর্ট তাহার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। আরও আরও দৃষ্টান্ত আছে। নৈহাটীর সহিত হুগলীর সংযোগের নিমিত্ত, বাষ্পীয় শকট চলাচলের সুবিধার জন্য গঙ্গার উপর যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, বহু প্রশংসাপত্র-প্রাপ্ত, উচ্চ-বেতনভোগী, পাকা ইঞ্জিনিয়ার লেস্‌লি সাহেব যে কার্য্যের নিমিত্ত লক্ষ টাকা বক্সিস লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন, পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই সেই রেলওয়ে-সেতু ফাটিয়া দমিয়া বসিয়া গিয়াছে; আর এই দুর্গম বনমধ্যস্থ শিবমন্দির স্মরণাতীত কালাবধি সমভাবে অটল রহিয়াছে। যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তুলনা করিয়া দেখুন,

সভ্যদেশের স্থপতিবিদ্যার সহিত আমাদের এই অসভ্য দেশের স্থপতিবিদ্যার কতদূর প্রভেদ।

জটাধারী আবার মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। শিব আছেন, গুমো ভূত আছে, মশাল আছে, অন্য কোন লোক নাই। জটাধারীর মনে মনে তর্ক, তারা তবে গেল কোথা? সত্যই কি দৃষ্টিভ্রম? সত্যই কি আমার মনের কল্পনা?—না, তেমন ত হতে পারে না। বেশ দেখেছি, দুজন লোক। শিবপূজা কর্‌তে এসেছিল, তাও অসম্ভব। মাথার চুল আর দাড়ীর চুল যে রকমে ক্ষৌরি করা, তাতে যেন নিশ্চয় বুঝা যায়, মুসলমান। শিবমন্দিরে মুসলমান! ইহাও ত বড় আশ্চর্য্য; কিন্তু তারা গেল কোথায়?

জটাধারী ভাবিল, তাহারা যখন এখানে আসিয়াছিল, তখন অবশ্যই আবার আসিবে; তাহারা মশাল জ্বালিয়া রাখিয়াছে, অবশ্যই এখানে তাহাদের কোন প্রকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। লুকাইল কেন, কোথায়ই বা লুকাইল, এইটুকু কেবল জটাধারীর চিন্তাপথে আসিল না।

প্রাচীন প্রাচীন ইতিবৃত্তে পাঠ করা যায়, প্রাচীন প্রাচীন অট্টালিকামধ্যে কলকৌশল-নির্ম্মিত গুপ্তদ্বার থাকে, এ মন্দিরেও হয় ত নীচে নামিবার সেইরূপ গুপ্তদ্বার থাকা সম্ভব। আমি আসিয়াছি, আমি উদাসীন, আমার বেশ আমাকে উদাসীন বলিয়াই জানাইয়া দিতেছে। আমি কোন লোকের মন্দ করিব না, যাহারা আমাকে দেখে, তাহারাই এইরূপ বুঝিয়া লইতে পারে, তবে কেন আমাকে দেখিয়া মন্দিরের লোকেরা লুকাইল কিম্বা পলাইল, এই চিন্তা পুনঃ পুনঃ জটাধারীর মনে ; চিন্তার সঙ্গে কত প্রকার অনুমান। একটা অনুমান, হয়

ত তাহারা মুসলমান নয়; মুসলমানের মত চুল কাটিয়াছে, মুসলমানের মত দাড়ী ভাগ করিয়াছে, ছদ্মবেশ ধরিয়াছে। কি অভিপ্রায়ে ছদ্মবেশ, গোপনে থাকিয়া সন্ধান লইলে বোধ হয় তাহাও জানা যাইতে পারিবে। দ্বিতীয় অনুমান, হয় ত তাহাদের উদ্দেশ্য ভাল নয়, উদ্দেশ্য ভাল হইলে শিবালয়ে আমার মত সন্ন্যাসী দেখিয়া কখনই তাহারা লুকাইত না। তৃতীয় অনুমান, কেবল তাহারাই দুজন কিম্বা তাহাদের সঙ্গী আরও অনেক লোক এই বনে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করে, মাটীর ভিতরে ভিতরে হয় ত পথ আছে, মনুষ্য থাকিবার উপযুক্ত গৃহাদি থাকাও অসম্ভব নহে। ইত্যাকার অনেক প্রকার অনুমান জটাধারীর অন্তরে যাতায়াত করিল, একটী অনুমানও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। জটাধারী একবার মনে করিল, মশালটা নিবাইয়া দিয়া মন্দিরের এককোণে বসিয়া থাকিলে হয় ত তাহাদের প্রত্যাগমন জানা যাইতে পারিবে; আবার মনে করিল, অন্ধকারে প্রত্যাগমন জানিয়াই বা কি ফল, এই রাত্রে আবার যদি আইসে, মুখ দুখানা চিনিয়া রাখা আবশ্যক হইবে, আলো থাকুক, বাহিরে গিয়া গুপ্তভাবে অপেক্ষা করা ভাল।

মশাল জ্বলিতে লাগিল, জটাধারী মন্দির হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। শিবের মন্দিরে গবাক্ষ থাকে না, একদিকে কিম্বা দুই দিকে ছোট ছোট খুব্‌রি খুব্‌রি ছিদ্রপথ থাকে; গাঁথুনির কৌশলে সেগুলিকে ঝাঁজরী বলিলেও বলা যায়। জটাধারী দক্ষিণদিকের ঝাঁজরীর এক ছিদ্রপথে চক্ষু রাখিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

রাত্রি অনুমান দুই প্রহর। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। বায়ু-সঞ্চালনে

বৃক্ষপত্রের শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হইতেছে না। জটাধারীর চক্ষু সেই ঝাঁজরীর ছিদ্রপথে স্থির।

হঠাৎ বোধ হইল যেন, মন্দিরের ভিতরে উত্তরদিকের ভিত্তি-সংলগ্ন একখানি টালী অল্প অল্প কাঁপিল। মন্দিরের তলভাগ মসৃণ, চারিধারেই বড় বড় টালী বসান; প্রতিদিন ভাল করিয়া ধৌত করিলে গৃহতল যেমন পরিষ্কার দেখায়, টালীগুলি সেইরূপ পরিষ্কার, কোথাও একটু উচুনীচু নাই। টালীখানা কাঁপিল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া একটু ফাঁক হইল; জটাধারীর চক্ষু অনিমেষে তাহা দর্শন করিতেছে, দেখিতে দেখিতে সেই স্থানটা আরও ফাঁক হইয়া গেল, একটা মনুষ্যমস্তক গলা পর্য্যন্ত বাহির হইল, প্রথম-প্রবেশের অগ্রে জটাধারী যে দুজন মনুষ্যকে দেখিয়াছিল, তাহাদের একজনের মস্তক যেরূপ, টালী ফাঁক করিয়া যে মস্তক উঠিল, সে মস্তকটাও ঠিক সেইরূপ। তাহারা আসিতেছে, জটা-ধারী এইরূপ স্থির করিল। উত্থিত মস্তকের উজ্জ্বল উজ্জ্বল নেত্র-দ্বয় চারিদিকে ঘুরিতেছিল; দক্ষিণদিকের ঝাঁজরীগাত্রে সেই ঘূর্ণিতনেত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সেই মুণ্ডটা তৎক্ষণাৎ গহ্বরে ডুবিল, টালীখানা পূর্ব্ববৎ ঢাকা পড়িয়া গেল; নড়িয়াছিল, উঠিয়াছিল, ফাঁক হইয়াছিল, এমন কোন চিহ্নই রহিল না।

জটাধারী বুঝিল, মন্দিরতলে গহ্বর আছে, গহ্বরে প্রবেশ করিলে গহ্বরবাসিগণকে দেখা যাইতে পারে, কিন্তু তলে তলে যদি বাহির হইবার পথ থাকে, থাকাই খুব সম্ভব, তাহা হইলে যাহারা আছে, তাহারা পলায়ন করিবে; সন্ধানের পূর্ব্বক্ষণে ঘাঁটা দেওয়া সার হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া জটাধারী সে রাত্রে আর গুপ্তগহ্বরে প্রবেশ করিবার আকিঞ্চন পাইল না, মন্দির-

মধ্যেও প্রবেশ করিল না, বারাণ্ডা হইতে নামিয়া পশ্চিমদিকে প্রায় তিনরশি তফাতে একটা বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক রজনী অতিবাহিত করিল। সে রজনীতে শারদীয় গগনমণ্ডল নির্ম্মল ছিল; শারদীয়া পঞ্চমী। শুক্লপক্ষের পঞ্চমী নয়, রাত্রি দুই প্রহরের পর আকাশ চন্দ্রশূন্য ছিল না, বনস্থলে অল্প অল্প জ্যোৎস্না পড়িয়াছিল, বৃক্ষশাখা অবলম্বনে রাত্রিযাপন করিতে জটাধারীর কোন কষ্ট হইল না।

বৃক্ষারোহী রাত্রিকালে বৃক্ষোপরি চুপ করিয়া ঘুমাইয়াছিল, এমন মনে করিতে হইবে না; ঘুমায় নাই, ঘুমাইবার জন্যও বৃক্ষে আরোহণ করে নাই, সতর্কভাবে সমান জাগিয়া ছিল। রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিল, আরোহী তখন দেখিল, পশ্চিমদিক্ হইতে প্রায় পঁচিশজন লোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাত আট জনের মস্তকে বড় বড় মোট। যে বৃক্ষে জটাধারী, সেই বৃক্ষতলে আসিয়া যখন তাহারা দাঁড়াইল, জটাধারীর মনে তখন একটা সন্দেহ আসিল। যদি কেহ উপরদিকে চায়, জ্যোৎস্নার আলোকে তাহাকে দেখিতে পাইবে, গাছে উঠিয়া হয় ত গণ্ডগোল বাধাইবে। সেই সন্দেহে জটাধারী নিবিড় পল্লবের মধ্যে লুকাইল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিল না।

যাহারা আসিল, তাহারা কেহই ঊর্দ্ধদিকে চাহিল না, যেন বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বৃক্ষতলে বসিল, মুটেরাও মোট নামাইয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া উত্তরীয়-বসনে বাতাস খাইতে লাগিল।

একটা হাসির হল্লা উঠিল। হাসির তুফান থামিলে, একজন বলিল, "বাবুরা বেশ মজার লোক; আমাদের সকলকে টুয়াইয়া দিয়া আপনারা বেশী বেশী অংশ ভোগ করেন, ধরা যদি পড়ি

আমরাই পড়িব, তাঁহারা ফাঁকে ফাঁকে এড়াইবেন, এই তাঁহাদের মৎলব। আজ আর এ সকল লুটের ভাগ তাঁহারা পাইবেন না, চালাকের উপর আজ আমরা বিলক্ষণ চালাকী খেলিয়াছি। আজ রাত্রে কোথায় আমরা গিয়াছিলাম, বাবুরা কিছুই সন্ধান জানেন না; আমরা দিনাজপুরে আসিয়াছি, সে খবর তাঁহারা জানেন, কিন্তু কোথায় আছি, সে স্থানটা তাঁহাদের অজ্ঞাত। বুদ্ধিবলে আমরাই তাঁহাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়াছি। যখন আমরা বরিশালে যাই, বৎসরে একদিন মাত্র, সেই দিনটী তাঁহাদের কেহ না কেহ আমাদের সঙ্গে থাকেন, এখানে আর চৌকী দিবার লোক থাকে না; বরিশালে বেশী টাকা, তাহাই তাঁহারা মনে করেন, কিন্তু এ জেলায় যে তাহার চারিগুণ পাঁচগুণ আমাদের হাতে পড়ে, সেটা হয় ত তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না, না ভাবাই ভাল; অংশ যদি দিতে হয়, ষোল অংশের এক অংশ দিব, দিতেই হইবে, না দিলে ধর্ম্ম থাকিবে না।"

বৃক্ষ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া জটাধারী মনে মনে ভাবিল, ইহাদের ধর্ম্মজ্ঞান এতদূর! ধর্ম্মের কৃপায় ইহারা অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করে! ইহাদের ধর্ম্ম ইহাদের মত নির্জ্জন গুহায় লুকাইয়া থাকে, ইহাদের বিধাতা-পুরুষও স্বতন্ত্র! অংশ দিতে হইবে, না দিলে ধর্ম্ম থাকিবে না, তাহাই ইহারা সার ভাবিয়াছে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহারা আরও কি বলে, শুনিবার আগ্রহে জটাধারী কাণ পাতিয়া রহিল।

প্রথম বক্তা নিস্তব্ধ হইলে আর এক ব্যক্তি বলিল, "কেন ভাই, অমন কথা বল, বাবুদের দোষ কি? বাবুদের আলস্য

নাই, একজনের কথা কি বলিতেছ, আমাদের মত দল বাঁধিয়া তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বরিশালে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে না থাকিলে, আমরা কি তেমন করিয়া কাছারী লুটিতে পারিতাম ?"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমরা কেবল বরিশালেই থাকি, আর কোথাও বেড়াই না, বাবুদের এমন বিশ্বাস নাই। সকল জেলা-তেই আমরা কারবার চালাই, তবে কি না, অন্যান্য জেলার পুলি-সের বিক্রম বেশী, বরিশালটা আমাদের পক্ষে নিরাপদ।"

হাস্য করিয়া প্রথম বক্তা বলিল, "আমাদের বড় ক্ষুধা, টপ্ টপ্ করিয়া পুলিস খাইতে পারি। পুলিসকে আমরা ভয় করি না, পুলিস বরং আমাদের নামে ভয় পায়। যেদিন আমরা—"

বলিতে বলিতে পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টিদান করিয়া সেই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল ; ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আর না, পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়া আসিল, চল, আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি।"

সকলে উঠিল, মুটেরা মোট মাথায় লইল, যে দিকে সেই শিবমন্দির, সরাসর সেই দিকেই সকলে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছে ; কোথায় তাহা-দের স্বস্থান, জটাধারী একদৃষ্টে পূর্ব্বদিকে চাহিয়া তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইল। পূর্ব্বদিকেই শিবমন্দির। লোকেরা চঞ্চল-গতিতে সেই দিকে গেল, কিন্তু মন্দিরের দ্বার দিয়া একজনও মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল না। মন্দিরের দক্ষিণধার দিয়া বক্র-ভাবে পূর্ব্বদিগ্ বিভাগে অদৃশ্য হইয়া গেল। সমুচ্চ মন্দির তাহাদিগকে লুকাইয়া ফেলিল।

মন্দিরের মশালটা তখন নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। কে

কখন্ আসিয়া নির্ব্বাণ করিয়াছে, জটাধারী তাহা জানিতে পারে নাই। মন্দির অন্ধকার। জটাধারী ভাবিল, ইহারাই তাহারা, ইহারাই বরিশালে ডাকাতী করে, ইহাদের দলপতি অনেকগুলি বাবু। দল এই অঞ্চলে আসিয়াছে, বাবুরা অন্তস্থানে আছেন। যখন আমি গুপ্ত সন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তখন অনেকেই আমাকে বলিয়াছিল, বরিশালের ডাকাতের দল, বাবুর দল। ডাকাতী করিবার অগ্রে এক একজনকে বর সাজাইয়া পাল্কীতে তুলিয়া লয়। গত বৎসর মাঘমাসে যে লোকটী বর সাজিয়াছিল, সেটী পরম সুন্দর ;—বরযাত্রিগণের মধ্যেও অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পুরুষ ছিল। সাধারণ ডাকাত ইতরজাতীয়,—তাহাদের ভিতর সুপুরুষ অতি অল্প থাকাই সম্ভব। বাবুদের দলে সুপুরুষ অধিক, পেশাদার, চোয়াড়, বাগ্দী, গোয়ালা, ডোম্ ইত্যাদি অল্প। বাবুর দল যখন সুসজ্জিত হইয়া বাহির হয়, তখন সেখানে উপযুক্ত ছায়া-চিত্রকর (ফটোগ্রাফার) থাকিলে ছবি তুলিয়া লইবার বড় সুবিধা হইত। মিছিলের ফটোগ্রাফ পাইলে আমি নখদর্পণে সমস্ত দর্শন করিতাম, তাহা নাই, তথাপি আমি অকৃতকার্য্য হইব, এমন মনে হইতেছে না ; যখন বাহির হইয়াছি, তখন অবশ্য সন্ধান করিব। ঐ মন্দিরের পঞ্চানন আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন।

মন্দিরের দিকে চাহিয়া জটাধারী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল ; তাহার পর আবার ভাবিল, মন্দিরমধ্যে যে দুইজন লোক পলকমাত্র আমার চক্ষে পড়িয়াছিল, ভিতরের টালী সরাইয়া যে একটা লোকের মুণ্ড বাহির হইয়াছিল, তাহারাও এই দলের লোক। টালীর ভিতর দিয়া ভূগর্ভে নামিবার পথ আছে, কিন্তু এই

সকল ডাকাত মন্দিরের ভিতর দিয়া গেল না ; মন্দির বেষ্টন করিয়া অন্যদিক্ দিয়া গেল। অন্যদিকে অবশ্য পথ আছে, একটা পথ পাইলেই অন্যান্য পথের নিদর্শন খুঁজিয়া লওয়া যাইতে পারিবে, সে পক্ষে ভাবনার বিষয় নাই ; কিন্তু সে দলের কত লোক এখানে আসিয়াছে, অগ্রে সেইটাই নির্ণয় করিতে হইবে। এই ত দেখা গেল পঁচিশজন। বাকী লোকেরা কোথায়? বরিশালের ডাকাতীর সংবাদে প্রকাশ হইয়াছিল, সে দলে দুই শতেরও অধিক লোক ; সকলে এখানে আসে নাই, তাহা এক প্রকার বুঝা হইয়াছে, বোধ হয়, দলে দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চৈত্র-বৈশাখমাসে, আশ্বিন-মাসে দুর্গাপূজার পূর্ব্বে মফঃস্বলের অনেক স্থলে ডাকাতী হয় ; দল একটা নহে, কিন্তু এই দলটাই বড়। এই দলের সন্ধান করিতে পারিলে শীকারীকুকুরেরা অন্যান্য দলের গন্ধ পাইবে।

প্রভাত হইল। জটাধারী বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিল, মন্দির দর্শনে গেল না, যে দিকে লোকালয়ের পথ, সেই দিকে সেই পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল ; লোকালয়ে গেল কিম্বা লোকালয় পার হইয়া অন্যকার্য্যে অন্য স্থলে চলিয়া গেল, তাহা তখন নিশ্চয় করিবার উপায় রহিল না।

দশদিন অতীত।—অমাবস্যা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দিনাজপুরের যে কাননে পঞ্চাননের মন্দির, সেই কানন ঘোরতর গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মন্দিরে পূর্ব্ববৎ মশাল জ্বলিতেছে, পট্টবস্ত্রপরিহিতা অষ্টালঙ্কারভূষিতা একটী প্রৌঢ়া রমণী পুষ্পপাত্র হস্তে সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাষ্ট্র-স্ত্রীলোকের ন্যায় কাছাকোঁচা দিয়া কাপড় পরা, অঙ্গে রেশমী বস্ত্রের জামা, মস্তকে

কবরী নাই, পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘবেণী বিলম্বিত, সঙ্গে একটী অষ্টমবর্ষীয় শিশু, মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ, গলদেশে সোণার মাদুলী, দুই হাতে দুগাছি সোণার বালা।

রমণী ভক্তিভাবে শিবপূজা করিতে বসিলেন, পুষ্পপাত্রে শ্বেতপুষ্প, বিল্বদল, দূর্ব্বাদল, আতপতণ্ডুল, শ্বেতচন্দন, ধূপ, দীপ, ধূনা।

ধূপ-দীপ জ্বালিয়া রমণী একখানি টালীর উপর ধূনা রাখিয়া দীপাগ্নিতে তাহা প্রধূমিত করিলেন। সমস্ত মন্দির সুগন্ধে আমোদিত হইল। অগ্রে অর্ঘ্যদান করিয়া অভ্যস্তমন্ত্রে ফুলবিল্ব-দলে রমণী শিবপূজা করিলেন; শিশুটী তাঁহার বামদিকে বসিল। শিশুর মস্তকে করার্পণ করিয়া রমণী বলিলেন, "প্রণাম কর, পঞ্চাননের কৃপায় তোমার মঙ্গললাভ হউক।" শিশু প্রণাম করিল, রমণীও গলবস্ত্র হইয়া মহাদেবের পাদপীঠে প্রণিপাত করিলেন। শুমো ভূতের মুখ দেখিয়া শিশুর ভয় হইয়াছিল, মস্তকে বিল্বপত্র স্পর্শ করিয়া রমণী তাহাকে অভয় দান করিলেন।

রাত্রি এক প্রহর। রমণী যেন শুনিলেন, মন্দিরের চারিধারে বারাণ্ডায় গুম্ গুম্ করিয়া মনুষ্যের পদশব্দ হইল। কেহ আসিয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত শিশুর হস্তধারণ পূর্ব্বক রমণী বাহির হইলেন। সম্মুখে মশালের আলো দীপ্তি পাইতেছিল, দুইধারের ঝাঁজরী দিয়াও মশালের আলো বাহির হইতেছিল, সতর্ক-নয়নে চাহিতে চাহিতে ধীরপদে রমণী মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রতবতী করযোড়ে পশুপতির স্তব করিতে করিতে নিমীলিত-নয়নে ধ্যানমগ্ন হইলেন। মন্দির-

মধ্যে স্তুতিপাঠের প্রতিধ্বনি হইল; শিশুটী বিস্ফারিত-নেত্রে রমণীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। ধ্যানভঙ্গ হইবার পর রমণী গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরের চারিধারে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন; কি তখন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল, তিনিই তাহা জানিতেন; পরিক্রমণ করিতে করিতে একটী স্থানে তাঁহার চরণতলস্থ একখানি টালী নড়িয়া উঠিল। রমণী চমকিত হইয়া সেইখানে বসিলেন, হস্তদ্বারা টালীখানা পরীক্ষা করিলেন;—বুঝিলেন, উহা তুলিতে পারিলে নীচে কি আছে, জানিতে পারা যাইবে। দুই হস্তে টালীখানা ধরিয়া তিনি ধীরে ধীরে উপরদিকে তুলিলেন, একটী চতুষ্কোণ গহ্বর দৃষ্টিগোচর হইল। চারিদিকের পরিমাণ সমান; প্রত্যেক দিকে দেড় হস্ত। সেই পথ দিয়া একটী মনুষ্যদেহ প্রবেশ করিতে পারে, অত্যন্ত স্থূলদেহ প্রবেশ করিতে পারে না। রমণী অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী ছিলেন না, গহ্বর দর্শনে তিনি মনে করিলেন, পশুপতির খেলা কিরূপ, নিম্নদেশে পাতালপুরীতে তিনি খেলা করিতে যান কি না, তাহা একবার দেখিয়া আসিব।

টালীখানি একপার্শ্বে রাখিয়া, গহ্বরমুখে হেঁট হইয়া বসিয়া, রমণী অনেকক্ষণ বিশেষরূপে তলভাগ নিরীক্ষণ করিলেন। তলভাগ অন্ধকার নয়, কোন প্রকার প্রস্তরের জ্যোতিতে আলোকিত। নিম্নদিকে ছোট ছোট অনেকগুলি সোপান। অনিমেষ-নেত্রে সোপানাবলী দর্শন করিয়া, তিনি একবার পঞ্চাননের দিকে মুখ ফিরাইলেন, করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহেশ্বর! তোমার মহিমা কে জানে? এই বিজন মন্দিরে প্রতিমা হইয়া তুমি বিরাজ করিতেছ; মন্দিরের নিম্নভাগে কি আছে, তাহা দর্শন করিতে আমার কৌতুহল জন্মিতেছে। বাঞ্ছাকল্পতরু!

আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর। শিশুটী লইয়া আমি এই সুড়ঙ্গপথে নামিব; বিপদ্‌বারণ! আমাদের যেন কোন বিপদ্ না ঘটে। কৈলাসপতি! তুমি পর্ব্বতবিহারী, ধর্ম্মাত্মা দিবোদাসকে কাশীরাজ্যে রাজা করিয়া তুমি মন্দরপর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছিলে, গহ্বরে কখন বাস করিয়াছ কি না, পুরাণে তাহা লেখা নাই; গল্পে শুনা যায়, ধর্ম্মভ্রষ্ট কালাপাহাড়ের উপদ্রবে কাশীধামে তুমি জ্ঞানবাপীতে ডুবিয়াছিলে। এই মন্দিরের নীচে জ্ঞানবাপী আছে কি না, তুমিই তাহা জান। ইচ্ছাময়! তুমি ইচ্ছা করিলে কোথায় কি না হইতে পারে, কোথায় কি না থাকিতে পারে? মনুষ্য-বুদ্ধি তাহা ভেদ করিতে পারে না, জ্ঞানবাপী অথবা অজ্ঞান-বাপী, যাহাই থাকুক, আমি তাহা দেখিব, এই সুড়ঙ্গপথে আমি নামিব, তুমি দয়া করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর।"

এইরূপে স্তব করিয়া রমণী পুনরায় পঞ্চাননকে প্রণিপাত করিলেন। "জয় বিশ্বেশ্বর" নাম উচ্চারণ করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রমণী সেই সুড়ঙ্গ-পথে নামিতে আরম্ভ করিলেন। ঘন ঘন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি সোপান। দুটী লোক পাশাপাশি হইয়া একটী সোপানে দাঁড়াইতে পারে না, একটী লোক অক্লেশে নামিতে উঠিতে পারে, এইরূপ গঠন।

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া রমণী নিম্নভাগের এক প্রশস্ত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পরিষ্কার প্রশস্ত ক্ষেত্র। ইহাই কি পাতাল? পুরাণে পাতালের যেরূপ বর্ণনা আছে, পাতালপুরী নাগরাজার রাজ্য, এই যে এক প্রবাদ আছে, ক্ষেত্র দর্শনে রমণী সেরূপ লক্ষণ কিছুই দেখিলেন না। শেষে সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া দূরে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তিনি দেখিলেন, সুদীর্ঘ

প্রাচীর। সচরাচর কারাগারের প্রাচীর যেরূপ গবাক্ষাদি ছিদ্রশূন্য হয়, সেইরূপ নিরেট প্রাচীর। একধার হইতে অপর-ধার পর্য্যন্ত নিখুঁত শুভ্রবর্ণ প্রাচীরগাত্রে বা প্রাচীরপারে গৃহাদি আছে। তাহা জানিবার অভিলাষে রমণী কি না, ক্রমে ক্রমে সেই ক্ষেত্রভূমি পার হইতে লাগিলেন; মহেশ্বরের নাম করিয়া নামিয়াছেন, মনে কোন প্রকার ভয় নাই। তিনি যেন দৈব-বল—দৈব-সাহস প্রাপ্ত হইয়া, অদ্রুতগতিতে পূর্ব্বকথিত প্রাচীরের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। বালকের মুখখানি তখন অল্প অল্প ঘামিয়াছিল, রমণী সস্নেহে সেই ঘর্ম্মসিক্ত সুন্দর মুখখানি চুম্বন করিলেন। কাহার উপদেশ কে জানে, দন্ত বিকাশ করিয়া শিশুটী হাসিয়া উঠিল। প্রাচীর-গাত্রে দ্বার নাই। পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত উত্তর-সীমার প্রাচীর। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া রমণী পূর্ব্বদিকের সীমায় উপস্থিত হই-লেন; সেদিকেও ঐরূপ। তাহার পর আবার উত্তরদিকে; তিন দিক্ পরিদর্শন করা হইল, কোন দিকেই প্রবেশের পথ দৃষ্টিগোচর হইল না। সুড়ঙ্গের ভিতর নামিয়াছেন, আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু আলো আছে; এখানে যাহারা থাকে, তাহারা উপর হইতে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে; মন্দিরের ভিতর হইতেও আসা যায়; অন্যদিক্ দিয়াও সুড়ঙ্গপথ আছে। কোন্ দিকে সেই সুড়ঙ্গ, প্রাচীর-বেষ্টনের সময় রমণী তাহা জানিতে পারিলেন না। চারিদিকে প্রাচীর; বাকী ছিল পশ্চিমদিক্-দর্শন। যেখানে পশ্চিমের প্রাচীর আরম্ভ, শিশুটীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া রমণী সেইখানে বসিলেন। রাত্রি দুই প্রহর হয় নাই, অথচ অত্যন্ত গভীর বোধ হইতেছিল। প্রাচীরের

অভ্যন্তরে গৃহ আছে, প্রাচীরের আয়তন দেখিয়া রমণী তাহা বুঝিলেন। তাঁহার অঞ্চলে কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী বাঁধা ছিল, বাহির করিয়া বালকটীকে খাইতে দিলেন, জল পাওয়া গেল না, উদ্বিগ্ন হইলেন; পুনরায় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পশ্চিমের প্রাচীর পূর্ব্ব-প্রাচীরের ন্যায় উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ, সেই দিক্‌টী অতি সাবধানে পরিভ্রমণ করিলেন। তক্তার উপর দিয়া চলিলে যেমন দম্‌দম্‌ করিয়া শব্দ হয়, একস্থানে সেইরূপ শব্দ হইল। যাঁহারা তক্তার সেতু পার হইয়াছেন, তাঁহারা সেই শব্দের প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। শব্দ হইবামাত্র ভিতরদিকে কুকুরের রব শ্রুতিগোচর হইল;—ঘোর গম্ভীর রব।

রমণী সেই স্থানে বসিলেন, হস্তদ্বারা প্রাচীর-গাত্র পরীক্ষা করিলেন, মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দুই তিন বার প্রাচীরে আঘাত করিলেন; পদতলে যেমন শব্দ হইয়াছিল, করাঘাতেও সেইরূপ শব্দ, সেইরূপ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের রব আরও গম্ভীর, আরও চঞ্চল। রমণী অনুমান করিলেন, এইখানেই দ্বার আছে; কিরূপে সেই দ্বার উন্মুক্ত হইতে পারে, তখন তাঁহার সেই চিন্তা আসিল। যতদূর পর্য্যন্ত কর-প্রসারণ করা যায়, তত দূর পর্য্যন্ত প্রসারণ করিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কোন স্থানে কলকব্জা আছে কি না। পরীক্ষা বিফল হইল; সেরূপ কোন চিহ্ন তিনি দেখিতে পাইলেন না; মনে মনে এক যুক্তি স্থির করিয়া পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরগাত্রে জোরে জোরে তিনবার পদাঘাত করিলেন। সেই আঘাতে সেই স্থানটা ফাঁক হইয়া গেল, দুই দিকে দুইখানা

তক্তা ঝুলিতে লাগিল ; ভিতরদিকে সমুজ্জ্বল আলো। বাহির হইতে রমণী দেখিলেন, বৃহৎ একটা দীপাধারে এক যোড়া মোমবাতী জ্বলিতেছে।

দ্বারপথ উন্মুক্ত হইবামাত্র কুক্কুরের রব অধিক বাড়িয়া উঠিল, ক্ষণমাত্রও বিরাম রহিল না। রবের সঙ্গে সঙ্গে ঝন্ ঝন্ শব্দে শিকল বাজিতে লাগিল। রমণী চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ এক কুকুর অদূরে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা রহিয়াছে। কুক্কুর দেখিয়াই মনের উল্লাসে রমণী ডাকিলেন, "মুস্তফী ! তুমি এখানে ?"

কুক্কুর তখন হুঙ্কার করিয়া সম্মুখের দুই হস্ত তুলিয়া রমণীর দিকে ঝাঁপাইয়া আসিল, ঘন ঘন লাঙ্গুল-সঞ্চালন করিতে লাগিল ; এক হস্ত ব্যবধান শৃঙ্খলে টান পড়িল, রমণীকে স্পর্শ করিতে পারিল না, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল, তাহা থামিয়া গেল। চাঞ্চল্য অন্য প্রকার।

বৃহৎ কুক্কুর। সচরাচর মহিষের শাবক যত বড় হয়, আকারে তত বড় ; দুই হস্ত অপেক্ষাও অধিক উচ্চ।

বালক তখনও রমণীর ক্রোড়ে ছিল। কর্ণ-লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে কুক্কুর ঘন ঘন সেই বালকের মুখের দিকে চাহিতেছিল, অস্থির হইয়া অস্ফুট কুঁ কুঁ কুঁ কুঁ শব্দে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। রমণী সেই সময় বালকটীকে তাহার সম্মুখে নামাইয়া দিলেন। কুকুর বারকতক বালকের অঙ্গ আঘ্রাণ লইয়া, সর্ব্বশরীর দুলাইয়া বালকের হাত-দুখানি চাটিতে আরম্ভ করিল। বালক তখন মুখ ফিরাইয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মুস্তফী এখানে কেন আসিয়াছে ?"

রমণী উত্তর করিবার অগ্রে সেইখানে আর এক দৃশ্য উপস্থিত। কুকুর ডাকিতেছিল, হঠাৎ থামিয়া গেল, ব্যাপার কি, তাহাই জানিবার জন্য দুটী সুন্দরী বালিকা হাত ধরাধরি করিয়া একটা ঘরের দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সুন্দরী দুটীকে বালিকা বলা হইল, বাস্তবিক তাহাদের বাল্যকাল অতীত হইয়াছিল; একটীর বয়স অনুমান পঞ্চদশ বর্ষ, দ্বিতীয়টী অনুমান ত্রয়োদশবর্ষীয়া। কিন্তু মস্তকের উচ্চতায় দুটীই প্রায় এক সমান; দুটীই পরম-সুন্দরী। মুখ দুখানি যেন শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মফুল; চক্ষু যেন মৃগচক্ষু; ওষ্ঠাধর আরক্ত; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ললাটের উপরে কুঞ্চিত কেশ ঝুলিয়া পড়িয়া কপোলের অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে; পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘ দীর্ঘ দুটী বেণী বিলম্বিত; উভয়েরই পরিধান নীলবসন; অঙ্গে অলঙ্কার নাই; হস্তে দুগাছি করিয়া কঙ্কণ; গলদেশে পুষ্পমাল্য। এই পর্য্যন্তই অলঙ্কার, তাহাতেই পরম শোভা। এত শোভা থাকিলেও, পদ্মফুলের মত মুখ হইলেও, সেই মুখ দুখানি অত্যন্ত বিমর্ষ; হঠাৎ নূতন দৃশ্য দর্শনে ঐরূপ ম্লান হইয়াছে, এমনও বোধ হইল না। বোধ হইল যেন, অন্তরস্থ কোন দুর্ভাবনায় সর্ব্বক্ষণ তাহারা ম্লানমুখী।

যে রমণী সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, একদৃষ্টে ঐ দুটী সুন্দরীর মুখপানে চাহিয়া তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন। বালিকারাও তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকটী কুকুরের সঙ্গে খেলা করিতেছিল, সে তখন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না।

গুপ্তদ্বার প্রশস্ত হইয়াছিল, রমণী প্রবেশ করিবার পর আপনা হইতেই পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; ভিতর হইতে বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। রমণী বুঝিয়াছিলেন, কলের কবাট।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বালকটীকে কুকুরের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া, সস্নেহে কুকুরের মস্তকে হাত বুলাইয়া, মুস্তফী মুস্তফী বলিয়া আদর করিয়া, রমণী তখন সেই দুটী বালিকার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন ; মনের বিস্ময় গোপনে রাখিয়া সস্নেহ-বচনে বলিলেন, "চল মা! তোমাদের ঘরে চল, তোমাদের অন্বেষণেই আমি এখানে আসিয়াছি।"

কলের পুতুল যেমন কলে চলে, বালিকা দুটী সেইরূপ ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলিল, শিশুর হস্ত ধারণ করিয়া, রমণী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

ভিতরে ক্ষুদ্র একটী গৃহ, কোন দিকে গবাক্ষ নাই, একটী-মাত্র দ্বার। তাহার দুই ধারে দুটী বিছানা, একটী তাকের উপর সামান্য কয়েকটী তৈজসপত্র, দেয়ালে একখানি দর্পণ। এই পর্য্যন্ত আসবাব। সে ঘরেও একটী বাতী জ্বলিতেছিল। বালিকারা কথা কহিল না, তাহাদের মধ্যে যেটী একটু বড়, সেইটী একটী অঙ্গুলী-সঙ্কেতে রমণীকে একটী শয্যা দেখাইয়া দিল ; রমণী বসিলেন, বালকটীও তাঁহার পার্শ্বে বসিল। কিয়ৎ-ক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বালিকা দুটীও দ্বিতীয় শয্যায় উপবেশন করিল।

চতুর্থ কাণ্ড।

ঘরে চারিটী প্রাণী। চারিটী মুখেই বাক্য নাই। রমণী ভাবিতেছেন, এ দুটী বালিকা কোথাকার? রূপ দেখিয়া অনুমান হইতেছে, বড়ঘরের কন্যা; কিন্তু ইহারা এখানে কেন? পূর্ব্বের অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে এটা ত ডাকাতের আড্ডা। এমন সুন্দরী ভদ্রলোকের কন্যারা ডাকা-তের আড্ডায় কেন রহিয়াছে? ডাকাতের কন্যা বলিয়া কিছুতেই ত বিশ্বাস হইতে পারে না। তবে ইহারা কে? আবার তিনি ভাবিলেন, হইলেও হইতে পারে, ডাকাতের দলে বাবু আছে, বাবুরাই ডাকাতের দলের সর্দ্দার; এ দুটী কন্যা যদি সেই সর্দ্দারগণের মধ্যে কোন একটী বাবুর কন্যা হয়, অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলেই বা ডাকা-তের আড্ডায় কন্যা আসিয়া থাকিবে কেন? সমস্যা বড় জটিল।

বাতীর দিকে চাহিয়া, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে রমণীর মনে আর একটা তর্ক উঠিল। মাটীর নীচে ঘর, ঘরের ভিতর বাতী জ্বলিতেছে; ঘরের বাহিরে অন্য আলো আর কিছুই নাই, অথচ অন্ধকার নহে; ইহারই বা কি কারণ? পরীর গল্পে পরীরাজ্যের যেরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সমৃদ্ধি শুনা যায়, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল বলিয়া মনে হয়, এখানে কি সেইরূপ কোন প্রকার ইন্দ্রজালের খেলা আছে? এই তর্ক তাঁহার মনে মনে। তর্কের মীমাংসা হয় ত এখনি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে আর একবার তিনি বালিকা-দুটীর মুখ-

বদন নিরীক্ষণ করিলেন। বালিকারা নির্নিমেষ-নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, তাহা দেখিয়া তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, কথা কহিলেই কথার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে; নিষ্কলঙ্ক বদনের—ঐ দুটী নিষ্কলঙ্ক নয়নের ভাব সেইরূপ; তথাপি হঠাৎ নূতন বিস্ময়ের পরাক্রমটা যতক্ষণ পর্য্যন্ত খর্ব্ব না হয়, ততক্ষণ সময় দেওয়া আবশ্যক। এই ভাবিয়া তিনি কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন না।

দুটী বালিকার মধ্যে যেটী একটু বড়, অধিক কৌতুহলে আকৃষ্ট হইয়া সেই বালিকাটী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে মা? তুমি এখানে কেমন কোরে এলে?"

রমণী উত্তর করিলেন, "পঞ্চাননের কৃপায়।—পঞ্চানন আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই পথেই আমি এসেছি। তোমরা কে বাছা? তোমরা এই পাতালপুরীতে কেন আছ? তোমাদের নাম কি? তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

বালিকা উত্তর করিল, "তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিব, কিন্তু তোমাকে আমি আর একটী কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই। ঐ কুকুরকে তুমি কেমন কোরে চিন্‌তে পাল্লে?"

হাস্য করিয়া রমণী বলিলেন, "আমি চিন্‌তে পাল্লেম কিম্বা কুকুর আমাকে চিন্‌তে পাল্লে, তা কি তোমরা বুঝ্‌তে পেরেছ? কুকুর যদি আমাকে চিন্‌তে পেরে থাকে, তোমার প্রশ্নের উত্তর কুকুরই জানে।"

বালিকারা হাস্য করিল। রমণী কহিলেন, "তোমাদের মুখের হাসি বড় সুন্দর। অন্য কথা রেখে দিয়ে তোমাদের পরিচয়টী আগে বল।"

বড় মেয়েটী বলিল, "আমাদের পরিচয় এখানে বড় বেশী নাই; যা কিছু আছে, দুই কথায় বুঝিয়ে দিব। তোমার পরিচয়টী আগে শুনি, তার পর আমাদের কথা।"

রমণী বলিলেন, "আমি পঞ্চাননের পরিচারিকা; পূজা কোত্তে এসেছিলেম, পঞ্চানন আমাকে প্রত্যাদেশ কোল্লেন, তাই শুনে আমি তোমাদের দেখ্‌তে এলেম। এখন বল, তোমাদের নাম কি?"

বালিকা উত্তর করিল, "আমার নাম সরোজিনী, আর আমার এই ভগ্নীটীর নাম বিনোদিনী। আমরা দুটী সহোদরা ভগ্নী।"

মৃদু হাস্য করিয়া রমণী বলিলেন, "সরোজিনী! প্রথমেই তুমি আমাকে 'মা' বলে ডেকেছ; আমিও তোমাদের দুটীকে পেটের মেয়ের মতন দেখ্‌ছি। আমার এই কিংশুকটী যেমন স্নেহের পাত্র, তোমরাও আজ আমার তেমনি স্নেহের পাত্রী হোলে। আমার নাম সুরধুনী। সুরধুনীর গর্ভে সরোজিনী বিনোদনীর জন্ম, তাই বল্‌ছি, আমি তোমাদের মা, তোমরা আমার মেয়ে।"

সম্বন্ধটা পাকাপাকি হইল। সুরধুনীর মুখে প্রকাশ পাইল, ঐ বালকটীর নাম কিংশুক। সরোজিনীকে সম্বোধন করিয়া সুরধুনী বলিলেন, "কিংশুক আমার পুত্র, তোমরা আমার কন্যা; কিংশুক আমার কাছে কোন কথা গোপন করে না, তোমরাও আমার কাছে কোন কথা গোপন করো না। যে যে কথা আমি জিজ্ঞাসা কোর্‌বো, ঠিক ঠিক উত্তর দিও, মায়ের কাছে মিথ্যাকথা বোল্লে পাপ হয়, তা তোমরা জানো?"

মেয়ে দুটীর চক্ষে জল পড়িল; শীঘ্র শীঘ্র অশ্রুমার্জ্জন করিয়া

সরোজিনী বলিল, "অনেকদিন আমরা মা দেখি নাই, আজ একটী নূতন মা পেলেম। যা কিছু আমরা জানি, একটী কথাও তোমার কাছে লুকাবো না।"

সুর। আমার প্রথম কথা, এখানে কার কাছে তোমরা থাকো? এখানে কারা থাকে?

সরো। তারা বলে, তারা ভূত, মহাদেবের অনুচর।

সুর। হাঁ, ভূত সকলেই। এক একটা ভূতের শরীরে পঞ্চভূত একত্র। আচ্ছা, ভূতেরা এখন কোথায়?

সরো। চরা কোত্তে বেরিয়েছে।

সুর। ভূতেরা চরা করে, তাদের কি দেখা যায়?

সরো। দেখা যায় বৈ কি? আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়, আমাদের সঙ্গে কথা কয়, আমাদের খাবার সামগ্রী এনে দেয়, দিনের বেলায় এইখানেই থাকে, রাত্রি হোলে বেরিয়ে যায়।

সুর। তাদের আকার কেমন?

সরো। মানুষের মতন।

সুর। কি জাত?

সরো। জান্‌তে পারি না।

সুর। তাদের ভিতর কি মুসলমান ভূত আছে?

সরো। তা নাই। তবে তারা—ভূত কি না,—এক এক সময় এক এক রকম সাজে।

সুর। রোজ রাত্রে সকলগুলাই কি বেরিয়ে যায়?

সরো। দুটো একটা থাকে। আজ অমাবস্যা কি না,—আজ সন্ধ্যাকালে সকলেই দল বেঁধে বেরিয়ে গিয়েছে।

সুর। কখন্ আস্‌বে?

সরো। ভোরবেলা।

সুর। কতদিন তোমরা এখানে আছ ?

সরো। আমরা যখন খুব ছোট, তখন থেকেই ভূতেরা আমাদের ধোরে রেখেছে ; এক জায়গায় রাখে না, ঠাঁই ঠাঁই সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ায়। এখানে আছি এক বৎসর।

সুর। আচ্ছা, মাটীর নীচে ঘর, ভূতেরা সুড়ঙ্গপথে যাওয়া আসা করে, তা তোমরা জানো ?

সরো। ভূত তারা, কোথা দিয়ে যায়, কোথা দিয়ে আসে, তা আমরা জানি না ; পথ আমাদের দেখায় না।

সুর। এক বৎসর পূর্ব্বে কোন্ পথ দিয়ে তোমাদের এখানে এনেছিল ?

সরো। মন্দিরের ভিতর দিয়ে।

সুর। আচ্ছা এই এক বৎসরের মধ্যে মন্দিরের ভিতর তোমরা গিয়েছিলে ?

সরো। একদিনও না। ভূতেরা আমাদের শিব দেখ্‌তে নিয়ে যায় না।

সুর। আচ্ছা, এক বৎসর তোমরা এখানে আছ, ভূতেরা কোন্ জাতি, তা তোমরা জানো না। তোমরা কোন্ জাতি, তা তোমাদের মনে আছে ?

সরো। আমার মনে আছে, বিনোদিনীর মনে নাই। বিনোদিনী তখন তিন বছরের। সে বয়সে কোন কথাই মনে থাকে না। আমার মনে আছে, আমরা ব্রাহ্মণের মেয়ে।

সুর। ব্রাহ্মণের মেয়ে ভূতের বাড়ীতে ?—এখানে তোমাদের খাওয়া দাওয়া কি রকম হয় ?

সরো। এখানে একটী ব্রাহ্মণ আছেন।

সুর। ব্রাহ্মণ ? ভূতের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ?—কি রকম ব্রাহ্মণ ? ব্রেহ্মদত্তি ?

সরো। না গো না ;—মানুষ ;—সত্তিকের মানুষ। বেশ রূপ।

বিনো। তিনি বলেন, আমাদের কাকা হন।

সরো। তিনি রাঁধেন, তিনিও খান, আমরাও খাই।

সুর। সেই ব্রাহ্মণ তোমাদের কাকা হয়, কাকাটীর নাম কি ?

সরো। কাকা বলেন, কাকার নাম ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজ।

সুর। বাঃ !—বেশ কাকা !—চোট্টারাজ !

সরো। না, না,—তুমি বল্‌তে জান্‌লে না ;—চোট্টারাজ নয়, চট্টরাজ।

সুর। আচ্ছা, কাকার নাম ত ওই হলো, তোমাদের বাবার নাম তোমার মনে আছে ?

সরো। আছে, আমার কান্না পাচ্ছে।—বাবার নাম রমানন্দ চট্টরাজ।

সুর। কোন্ গ্রামে তোমাদের বাড়ী ছিল, তা তোমার মনে হয় ?

সরো। গাঁয়ের নাম মনে হয় না, কিন্তু সেই গাঁয়ের কাছে একটা জায়গা আছে, সেই জায়গার নাম তিরপুনী।

সুর। হাঁ, আমিও জানি, ত্রিবেণী নামটা খুব প্রসিদ্ধ। আচ্ছা, তোমাদের কাকা এই ভূতের দলে এসে কেন আছে, তা তোমরা জান্‌তে পেরেছ ? তোমাদের উপর তার ভালবাসা কেমন ?

সরো। খুব ভালবাসা;—খুব আদর। তিনি আমাদের ভাল ভাল খাবার জিনিস এনে দেন, বই কিনে দেন, বই পড়ান, বই দেখে দেখে—

সুর। তোমরা তবে লেখাপড়া জানো?

সরো। লেখা জানি না, ছাপার অক্ষর পড়্‌তে পারি। রাম-লক্ষ্মণের কথা, মহাভারতের কথা, কাশীবিশ্বেশ্বরের কথা, এই সব আমরা পড়ি।

সুর। বেশ কর, তোমাদের কাকা তোমাদের বাড়ীর কথা কিছু বলে?

সরো। কিছুই বলেন না, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, তিনি চুপ কোরে থাকেন।

সুর। আচ্ছা, ভূতেরা তোমাদের ধোরে রেখেছে, তোমাদের বাবা এ কথা জানেন?

সরো। তা আমরা কেমন কোরে জান্‌বো? কোথায় বাবা, কোথায় আমরা, তাই আমরা জানি না; বাবা আমাদের খোঁজ করেন কি না, সে কথা আমাদের কে বোল্‌বে?

সুর। আচ্ছা, ভূতেরা তোমাদের কেন ধোরে রেখেছে, সে কথা তোমরা কিছু জান্‌তে পেরেছ?

সরো। কাকা একদিন বলেছিলেন, আমাদের দাম আছে, ভূতেরা যদি দশহাজার টাকা পায়, তা হোলে আমাদের ছেড়ে দেয়। কাকার তত টাকা নাই, তিনি আমাদের খালাস কোত্তে [illegible]ন না।

[illegible]র। ভূতেরা টাকা চায়? ভূতের টাকার ভাবনা কি? [illegible]মনে কোল্লেই কত লোকের কত টাকা উড়িয়ে আন্‌তে

পারে, পৃথিবীর সব টাকা এক জায়গায় জমা কোত্তে পারে, মনে কোল্লে কুবেরের ভাণ্ডার লুঠ কোত্তে পারে, সামান্য দশহাজার টাকার জন্য তোমাদের মতন দুটী পদ্মফুলকে আটক কোরে রেখেছে, এ কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

সরো। তোমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু কাকা বলেন, দশ হাজার টাকা তারা চায়।

সুর। আচ্ছা, আমি যদি তোমাদের উদ্ধার কোত্তে পারি, আমার সঙ্গে যেতে তোমরা রাজী আছ ?

চমকিয়া উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া চমকিতস্বরে সরোজিনী বলিল, "ও মা ! বল কি তুমি ? আর বেশী রাত নেই, এখনি তারা এসে পোড়্বে, তুমি তাদের কেল্লার ভেতর এসে পোড়েছ, আমাদের সঙ্গে গল্প কচ্ছো, এ যদি তারা দেখ্তে পায়, তোমা-কেও মেরে ফেল্বে, তোমার ঐ ছেলেটীকেও মেরে ফেল্বে, আমাদের দুটীকেও গলা টিপে মার্বে।"

গম্ভীরবদনে সুরধুনী বলিলেন, "আমি তোমাদের উদ্ধার কোর্বো। ভোর হবার এখনো দেরী আছে। তোমরা যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও, কোন্ দিক্ দিয়ে আমি তোমাদের নিয়ে যাব, ভূতেরা তা জান্তেও পার্বে না।"

সরোজিনী বলিল, "ভূতেরা সব জান্তে পারে, যেখানে যখন যা হয়, সব তারা জানে ; কেমন কোরে তুমি আমাদের নিয়ে পালাতে সাহস কর ? কেমন কোরে তুমি ভূতের চক্ষু এড়াবে ?"

সুরধুনী বলিলেন, "ভূতের চেয়ে বড় এমন একদল লোক আছে, তাদের নাম গন্ধর্ব্বলোক ; তোমরা মহাভারত পড়েছ, অবশ্যই মনে কোত্তে পার্বে, বিরাট্‌দেশে পঞ্চপাণ্ডব যখন অজ্ঞাত-

বাসে ছিলেন, সেই সময় কীচক নামে একটা দুরন্ত অসুর পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদীকে পদাঘাত কোরেছিল; বল্লভনামধারী ভীমসেন নারীবেশে সেই কীচককে কুষ্মাণ্ডাকারে বধ করেন। মৃতদেহ দেখে বিরাটরাজ্যের লোকেরা বলেছিল, গন্ধর্ব্বে মেরেছে। গন্ধর্ব্বেরা ঐ রকমেই অসুর মারে। অসুর আর ভূত প্রায় একজাতি; অসুরেরাও কালো, ভূতেরাও কালো। গন্ধর্ব্বেরা যখন অসুর নিপাত কোত্তে পারে, তখন অবশ্যই অবহেলায় ভূতবংশ নির্ব্বংশ কোত্তেও তারা সমর্থ। গন্ধর্ব্বেরা আমার সহায় আছেন, গন্ধর্ব্বেরা তোমাদের রক্ষা কোর্‌বেন, তোমরা রাজী হও; নিশ্চয়ই নিরাপদে আমি তোমাদের উদ্ধার কোত্তে পার্‌বো। পশুপতি পঞ্চাননের বর আছে, দুষ্ট লোকেরা আমাকে দেখ্‌তে পায় না; আমার সঙ্গে যারা থাকে, আমার শরণাগত যারা হয়, তাদেরও দেখ্‌তে পায় না। পূর্ব্বে বলেছি, আমি তোমাদের 'মা', তোমরা আমার 'মেয়ে'; পঞ্চাননের কৃপায় আমি যদি তোমাদের উদ্ধার কেত্তে না পারি, তা হোলে পঞ্চাননের নাম মিথ্যা হবে, মহিমাও মিথ্যা হবে; তোমরা রাজী হও, ভোর হবার দেরী আছে; রাত্রি থাক্‌তে থাক্‌তেই—হাঁ, ভাল কথা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে আমি ভুলে যাচ্ছিলেম। তুমি যেটাকে ভূতের কেল্লা বল্‌ছো, আমি তাই বল্‌ছি। মাটীর নীচে কেল্লা; এই কেল্লার ভিতর আলো আসে কোথা থেকে?"

সরোজিনী উত্তর করিল, "কাকাকে একদিন আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, তিনি বলেছিলেন, একরকম পাথর আছে, রেতের বেলায় সে পাথর জ্বলে। শিবের মন্দিরের সিঁড়িতেও সেই রকম একখানা পাথর আছে, কেল্লার পাঁচীলের গায়েও

একখানা আছে। কোথায় আছে, ঠিক দেখা যায় না; কিন্তু জ্বলে, তাতেই আলো হয়।”

সুরধুনী বলিলেন, “উত্তম। পাথর একখানা সঙ্গে কোরে নিতে পাল্লে অন্ধকার বনপথে বড় সুবিধা হোতে পাত্তো; কিন্তু পাবার উপায় নাই। তা হোক, বনপথ আমার জানা হয়েছে, রাত্রি থাক্‌তে থাক্‌তেই নির্ব্বিঘ্নে আমি তোমাদের দুটীকে অন্ধকার অরণ্য পার কোরে নিয়ে যেতে পার্‌বো; তোমরা প্রস্তুত হও।”

ভাল কথায় বালিকাদের মন ভুলাইতে অধিকক্ষণ লাগে না। সুরধুনী দেবী শিষ্ট মিষ্ট বচনে ভরসা দিয়া বালিকা দুটীকে রাজী করিলেন, প্রস্তুত হইতে বলিলেন, তাহারা আর প্রস্তুত হইবে কি? ডাকাতের ঘরে তাহাদের নিজের সম্বল কিছুই ছিল না, যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ছিল, সেই বস্ত্রেই তাহারা প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইল। বিনোদিনী সেই সময় কি ভাবিয়া কাতর-বচনে ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “আর কাকা?”

মৃদু হাস্য করিয়া সুরধুনী বলিলেন, “কাকার জন্য ভাবনা কি? কাকাকে একদিন আমি দেখাইব, আমার কাছেই তোমরা তোমাদের কাকাকে দেখিতে পাইবে।”

যথার্থই তখন উষা আসিবার বিলম্ব ছিল, রাত্রি প্রায় ছয়দণ্ড অবশিষ্ট। কিংশুকের হস্তধারণ পূর্ব্বক সুরধুনী দেবী বালিকাদের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বালিকা দুটী তাঁহার অনুগামিনী। কলের কবাটে পদাঘাত করিবামাত্র কবাট ফাঁক হইয়া গেল। কিংশুকের হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া সুরধুনী সেই সময় দ্বারের কুকুরের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিয়া তিনবার শীস দিলেন। কুকুর

নীরব। অগ্রে অগ্রে সুরধুনী, পশ্চাতে সরোজিনী, বিনোদিনী, কিংশুক ; সর্ব্বপশ্চাতে মুস্তফী। মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির নিকটে গিয়া সুরধুনী আবার শীস দিলেন, মুস্তফী একবেষ্টনে অগ্রগামী হইয়া সোপান বাহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল ; মুস্তফীর পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহারা চারিজন।

মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুরধুনী দেবী ভক্তিভাবে পঞ্চাননকে প্রণিপাত করিলেন ; তাঁহার আদেশে বালক-বালিকারাও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। সুরধুনীর পুষ্পপাত্রখানি মন্দিরেই ছিল ; তিনি সেইখানি হস্তে লইয়া মন্দির হইতে বাহির হইলেন। অগ্রে অগ্রে মুস্তফী। সুরধুনীর পশ্চাতে যাহারা ছিল, তাহারা অগ্রে আসিল, সর্ব্বপশ্চাতে রহিলেন সুরধুনী। এইখানে পাঠক মহাশয় জানিয়া রাখুন, সুরধুনীকে দেবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইতেছে, সেই ক্ষেত্রের পরিচয়ই ঐরূপ। দস্যু-নিবাসে মহালয়া অমাবস্যার রজনীতে সুরধুনীর পরিচয় ব্রাহ্মণকন্যা, সরোজিনী বিনোদিনী ব্রাহ্মণকন্যা, কিংশুকটী ব্রাহ্মণ-কুমার। কেবল মুস্তফীটী ব্রাহ্মণ নহে। মাটীর ভিতর দস্যু-নিবাসে মুস্তফীটী বাঁধা ছিল, সেই মুস্তফী কি প্রকারে বিদেশিনী সুরধুনীর বশীভূত—আজ্ঞাবহ হইল, কি বুঝিয়াই বা কিংশুকের হাত চাটিয়াছিল, সে সকল কথা সময়ান্তরে যথাস্থানে প্রকাশ পাইবে।

উষার আবরণ থাকিতে থাকিতেই সঙ্গীগুলিকে লইয়া সুরধুনী দেবী মহীপাল-কানন পার হইয়া গেলেন, লোকালয়ে প্রবেশ করিলেন। প্রভাত হইলে স্থানীয় লোকেরা দেখিল, নূতন দৃশ্য। একটী পৌঢ়া রমণী, দুটী সুন্দরী বালিকা, একটী সুন্দর বালক আর একটী কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর। কোথা হইতে তাহারা

আসিল, কোথায় বা যাইবে, রমণীকে কেহই সে কথা জিজ্ঞাসা করিল না; সুরধুনীও উপযাচিকা হইয়া কাহারও নিকটে কোন পরিচয় দিলেন না,—কথাই কহিলেন না। কোথায় তাঁহারা গেলেন, দিনাজপুরে রহিলেন কিম্বা স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন, কেহই তাহা জানিল না। সুরধুনীর সঙ্গে সম্ভবমত অর্থ ছিল, যান-বাহনের ভাড়া কিম্বা আহার্য্যসামগ্রীর মূল্যের অভাব হইল না।

পঞ্চম কাণ্ড।

বৎসরের শরৎ-ঋতুটী বঙ্গদেশে আনন্দ-ঋতু নামে অভিহিত। এই ঋতুতে বঙ্গের ভাগ্যবন্ত গৃহে গৃহে মহামায়ার অধিষ্ঠান হয়। তৎপরে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি পর্ব্বাহ;—স্থূলকথায় শরতের ছয় সপ্তাহ কাল হিন্দুর মহোৎসবে মহোৎসবে কাটিয়া যায়। এই ঋতুতে প্রকৃতি সুন্দরী যেমন সহাস্যবদনা, বঙ্গবাসী প্রকৃতিপুঞ্জও তদ্রূপ সহাস্য-আস্য। গগনমণ্ডল নির্ম্মল; শরচ্চন্দ্র নির্ম্মল, সরোবর নির্ম্মল, কমলদল নির্ম্মল, নদনদী নির্ম্মল, ধরাতল নির্ম্মল, উৎসবের আমোদে আর্য্য-সংসারের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলিও নির্ম্মল। উপবনে উপবনে নানাজাতি সুন্দর কুসুম প্রস্ফুটিত। ভারতীয় কবিগণের বর্ণনায় বসন্ত-ঋতু ও শরৎ-ঋতুর সমধিক গৌরব।

সুখের শরৎ-ঋতুর অবসান। হেমন্তের সমাগম। পূর্ণিমার পর হইতেই শীতের প্রারম্ভ। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাস অতীত হইয়া গেল। পৌষমাসের পঞ্চদশ দিবসে একজন পরিব্রাজক

সদাগর বরিশাল জেলার সেই জমিদারী কাছারীর সম্মুখে পরিক্রমণ করিতেছেন। দেখিতে পরম রূপবান্, বদনে গাম্ভীর্য্য ও তেজস্বিতা সুপ্রকাশ, নয়নে যেন অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত, ললাট প্রশস্ত, মুখে গোঁপ-দাড়ী নাই, কপোলযুগল দিব্য পূরন্ত, তাহাতে অল্প অল্প গোলাপী আভা, পরিধান সবুজবর্ণ ঢিলা ইজার, অঙ্গে লোহিতবর্ণ বুটাদার চাপ্‌কান, তাহার উপর গোটাদার জামিয়ার; মস্তকে পীতবর্ণ মহাজনী পাগ্‌ড়ী, হস্তে একটী কার্পেটের ব্যাগ, বয়স অনুমান চল্লিশ একচল্লিশ বৎসর।

পরিক্রমণ করিতে করিতে সেই মহাজন প্রদীপ্ত চঞ্চল নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কৃষকেরা চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে ধান্য-চ্ছেদন করিয়াছে, কতক কতক গৃহে লইয়া গিয়াছে, কতক কতক ক্ষেত্রভূমিতে শুষ্ক হইতেছে। চারিদিকে কৃষকগণের তৃণাচ্ছাদিত বাসগৃহ ও গোলাঘর নয়নগোচর হইতেছে, মহাজন তাহাই দেখিতেছেন। বেলা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কাছারী-বাড়ীর ভিতর হইতে একটী যুবাপুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে দুইজন পারিষদ। সম্মুখে মহাজনকে দেখিয়া সেই যুবাপুরুষ ভদ্রোচিত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মহাশয় আপনি? কোথা হইতে আসিতেছেন? এখানে কাহার তত্ত্ব করেন?"

মহাজন উত্তর করিলেন, "বাবু মহানন্দ মহাপাত্র এখানকার জমিদার, তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন। আমি মণিরত্নের মহাজন, প্রয়াগধাম হইতে আসিয়াছি, মাসেক দুমাস এই অঞ্চলে থাকিবার ইচ্ছা আছে, কোথায় উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায়, গ্রামের মধ্যে একজনকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলাম, শুনিলাম, মহানন্দ বাবুর নিকটে তত্ত্ব লইলেই তাহা জানিতে পারিব। তদ্ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে আরও আমার অনেক কথা আছে, সাক্ষাৎ হইলেই বলিতে পারি।"

যুবাপুরুষ কহিলেন, "তাঁহার সঙ্গে কি আপনার আলাপ আছে?"

মহাজন কহিলেন, "আলাপ নাই, ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতে অধিকক্ষণ বিলম্ব হয় না, সেই বিশ্বাসেই সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ।"

যুবাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রয়াগধামেই কি আপনার নিবাস?"

মহাজন বলিলেন, "নিবাস আমার সেখানে নয়, আমি বঙ্গদেশ-নিবাসী; বিষয়কার্য্যের অনুরোধে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানেই আমার গতিবিধি আছে; প্রয়াগেই বেশীদিন থাকি।"

যুবাপুরুষ কহিলেন, "মহানন্দ বাবু এখানে উপস্থিত নাই। যদি বিষয়কর্ম্মের কোন কথা থাকে, আমার সাক্ষাতেই বলিতে পারেন, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর।"

মহাজন বলিলেন, "বিষয়কর্ম্মের কথাই অনেক। আপনি যদি আমার সকল কথার সদুত্তর দিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে অবশ্যই আমি সকল কথা আপনাকে বলিব।"

এই যুবাপুরুষের নাম সদানন্দ মহাপাত্র। স্বভাবে অতি অমায়িক, অতি মিষ্টভাষী, ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় যথাসম্ভব অধিকার আছে, বিষয়বুদ্ধিতে সুদক্ষ, বয়স অনুমান ২৬।২৭ বৎসর। মহাজনের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "ভদ্রলোকের বাক্যে

যথাজ্ঞান সদুত্তর দানে কুণ্ঠিত হওয়া আমার অভ্যাস নয়; আসুন আপনি, বাড়ীর মধ্যে আসুন।"

মহাজনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সঙ্গীদ্বয় সহ সদানন্দ বাবু কাছারী-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উপরের যে ঘরে জমিদারেরা আসিয়া কাছারী করেন, সেই ঘরেই তিনি মহাজনকে লইয়া গেলেন; সকলে উপবিষ্ট হইলে, সময়োচিত বাক্যালাপের পর, মহাজন একবার সদানন্দ বাবুর সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। সদানন্দ বাবু বুঝিলেন, নির্জ্জনে কথোপকথন করা মহাজনের ইচ্ছা। ইহা বুঝিয়াই সঙ্গী দুটীকে তিনি একবার অন্যঘরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। মহাজনের দিকে চাইতে চাইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।

জমিদার-পরিবারের একজন বাবু প্রতিবৎসর জমিদারীতে আইসেন না। গতবৎসর মহানন্দ বাবু আসিয়াছিলেন, এ বৎসর তিনি আইসেন নাই, তাঁহার সহোদর আসিয়াছেন। বৎসর বৎসর আদায়-তহসীল যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ হইতেছে, বিশেষের মধ্যে এই যে, সদানন্দ বাবু কিছু অধিক দয়ালু; প্রজালোকের ঘরাঘরি বিবাদে কাছারীতে নালিশ হইলে তিনি সামান্য সামান্য অপরাধিগণের অধিক জরিমানা করেন না; নজর-সেলামী ব্যতীত অন্য কোন অবৈধ বাজে আদায়ের প্রতি তাঁহার অধিক ঝোঁক নাই, সেই কারণে প্রজালোকেরা তাঁহার উপর অধিক সন্তুষ্ট। মহাজনের নাম গোপেশ্বর ঘোষাল। বিষয়কর্ম্মের কথার সূত্রপাত করিয়া গোপেশ্বর বলিলেন, "আপনাদের জমিদারীতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়, আমি আপনাদের অধিকারে দুইশত কি তিনশত বিঘা জমি পাট্টা লইতে ইচ্ছা করি; উপযুক্ত পাট্টা-

সেলামী যাহা দিতে হয়, তাহা দিতে আমি প্রস্তুত আছি। প্রায় দশবৎসর কাল প্রবাসের কষ্ট স্বীকার করিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর বিদেশে যাইতে ইচ্ছা নাই। বাঁকুড়া জেলায় আমার পৈতৃক নিবাস, সেই স্থানে আসিয়া বাস করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প।"

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "আমাদের সমস্ত জমি দস্তরমত প্রজাবিলী আছে, তবে যে সকল জমি বৎসর বৎসর ঠিকাহারে নূতন বন্দোবস্ত হয়, সাবেক প্রজার জমা অপেক্ষা বেশী জমা কবুল করিলে দোসরা প্রজা বিলী করা হইয়া থাকে। আপনি যদি সেই রকমে ঠিকাহারে মেয়াদী পাট্টা লইতে চাহেন, তাহা হইলে চৈত্রমাসে একবার আসিবেন, সুবিধামত আমি আপনার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিব। চৈত্রমাসের শেষ পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকিব, আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয়, অনুগ্রহ করিয়া সেই সময় আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবেন। আপনি আজ এখানে নূতন আসিয়াছেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আজ আপনি আমার অতিথি, দয়া করিয়া আজ রাত্রে আপনি এইখানেই অবস্থান করুন, আমি সুখী হইব।"

গোপেশ্বর বলিলেন, "পরম আপ্যায়িত হইলাম। যে কথা এখন বলিলাম, তদ্ব্যতীত আর একটা বিশেষ কথা আমার বলিবার আছে; রাত্রিকালে অবসর পাইলে তাহা বিশেষ করিয়া আপনাকে আমি জানাইতে পারিব। আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ না থাকিলেও আপনার প্রজালোকের মুখে তাঁহার অনেক প্রশংসার কথা আমি শুনিয়াছি। আপনার সদ্ব্যবহার প্রত্যক্ষে দর্শন করিলাম। আমি আপনাদের

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। রাত্রিকালে যে কথা আমি বলিব, নিশ্চয়ই তাহাতে আপনাদের মঙ্গল হইবে; বিস্তর দুষ্টলোক দমন হইয়া যাইবে।”

কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সদানন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “দুষ্টলোক আপনি কাহাকে বলিতেছেন? আমাদের জমিদারীর প্রজামণ্ডলীর মধ্যে দুষ্টলোক নাই, তাহারা কখনও অবাধ্য হয় না; নিতান্ত দুরবস্থায় না পড়িলে কেহই খাজনা বাকী ফেলে না, গরীবলোকের খাজনা বাকী পড়িলে আদায়ের জন্য আমরা কখন জুলুম করি না, বরং অবস্থাবিশেষে ক্ষমা করিয়া থাকি।”

গোপেশ্বর বলিলেন, “ও সব কথা আপনি কেন বলিতেছেন? প্রজাদের ভিতর দুষ্টলোক আছে, সে কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। যাহাদের দ্বারা—না,—রাত্রিকালে যাহা আমি বলিব, তাহা শুনিলেই আপনি আমার মনোগত অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।”

সন্ধ্যা হইল,—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল,—রাত্রি চারি দণ্ড। সদানন্দবাবু কহিলেন, “আজ দিনমানে আপনি অনেকদূর পরিভ্রমণ করিয়াছেন, অতিশয় পরিশ্রান্ত আছেন, অগ্রে আহারাদি করুন, তাহার পর সকল কথা আমি শুনিব।”

আহারাদির পর বাবু আর মহাজন স্বতন্ত্র একটী নির্জ্জন গৃহে উপবেশন করিলেন। মহাজন যাহা যাহা বলিলেন, বাবু তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া মহা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, “ও! আপনি তবে পশ্চিমদেশে থাকেন না; এতক্ষণ আপনি আমার কাছে সত্য গোপন করিতেছিলেন। পশ্চিমদেশে থাকি”

ও সকল বৃত্তান্ত আপনি জানিতে পারিতেন না ; যাহা যাহা আপনি করিয়াছেন, তাহাও করিতে পারিতেন না; ধন্য আপনার বুদ্ধি ! ধন্য আপনার ক্ষমতা ! ধন্য আপনার দক্ষতা !"

গম্ভীরবদনে গোপেশ্বর বলিলেন, "সাক্ষাতে যাহাদের প্রশংসা করা হয়, সুবোধ না হইলে তাহাদের অহঙ্কার বাড়ে ; অসাক্ষাতে যাহাদের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহারাই যথার্থ প্রশংসার পাত্র। এখানে আমি এমন কার্য্য কিছুই করি নাই, যাহার জন্য প্রশংসা পাইতে পারি। আপনি দোষ ধরিবেন না, যথার্থ কারণ উপস্থিত না থাকিলেও লোকের মুখের উপর যে সকল প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হয়, অনেক স্থলে অনেক সময়ে সে সকল বাক্যের ভিন্ন নাম খোসামোদ। আপনি স্থির জানিবেন, আমি খোসামোদ ভালবাসি না ; কার্য্যক্ষেত্রে যে পরিচয় হয়, প্রশংসা অপ্রশংসা তাহার উপরেই নির্ভর করে।"

বাবু কহিলেন, "আমি আপনার খোসামোদ করি নাই ; কবিগণ গঙ্গার মহিমা বর্ণন করেন, তাঁহারা গঙ্গার খোসামোদ করেন না। আপনিও গঙ্গা ; আপনার মুখে শুনিলাম, আপনি সুরধুনী নাম—"

চঞ্চলস্বরে বাধা দিয়া গোপেশ্বর বলিলেন, "চুপ করুন, সে কথা এখন উত্থাপন করিবেন না। আপনি কবি হইতে পারেন, কিন্তু গঙ্গার মহিমা অবিশ্বাসীকে শুনাইতে নাই।"

বাবু বলিলেন, "এখানে অবিশ্বাসী আর কে আছে ?"

গোপেশ্বর চুপি চুপি বলিলেন, "এখন এখানকার বাতাস পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী। আপনি আপনাদের নায়েব মহাশয়কে একবার ডাকিতে বলুন।"

ঘরের বাহিরে একজন চাকর দাঁড়াইয়া ছিল, বাবুর সহিত গোপেশ্বরের চুপি চুপি কথা হইল, চাকর তাহার একটী বর্ণও শুনিতে পায় নাই, বাবু একটু উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া নায়েব মহাশয়কে সংবাদ দিবার হুকুম দিলেন।

দশ মিনিট পরেই নায়েব মহাশয় সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাকর পূর্ব্ববৎ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। নায়েব মহাশয় উপবিষ্ট হইলে, অনেকক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহাজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন ?"

যেন একটু চমকিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মহাজনের পূর্ণ বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নায়েব মহাশয় উত্তর করিলেন, "আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, বোধ হয়, যেন পূর্ব্বে কোথাও একবারমাত্র আপনাকে দেখিয়া থাকিব, ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না।"

মৃদু মৃদু হাসিয়া মহাজন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত বৎসর চৈত্রমাসের শেষে মহানন্দ বাবু যখন এখানে উপস্থিত ছিলেন, তৎকালে একজন ঘোড়সওয়ার আসিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে আছে।"

মহাজন পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "বাবুর সাক্ষাতে সেই ঘোড়সওয়ার কি কি কথা বলিয়াছিল, তাহা আপনার মনে আছে ?"

একটু চিন্তা করিয়া নায়েব মহাশয় উত্তর করিলেন, "সওয়ার চলিয়া যাইবার পর বাবুর আদেশে সেইকথাগুলি আমি আমার পঞ্জিকার পৃষ্ঠদেশে লিখিয়া রাখিয়াছি; সকল কথাই আমার মনে আছে।"

মহাজনের সহিত নায়েব মহাশয়ের যে কয়েকটী কথা হইল, সদানন্দ বাবু তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না, অবাক্ হইয়া অনিমেষ-নয়নে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

নায়েব মহাশয়ের নিকটে একটু সরিয়া বসিয়া, তাঁহার মুখের কাছে মুখ উঁচু করিয়া মহাজন কহিলেন, "ভাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন! সেই ঘোড়সওয়ারের মুখের সহিত আমার মুখের কোনরূপ সাদৃশ্য আছে কি না, স্মরণ করিয়া বলুন।"

ভাল করিয়া মহাজনের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া নায়েব মহাশয় যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার অন্তরে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল; একবার বাবুর মুখের দিকে, তৎক্ষণাৎ আবার চক্ষু ফিরাইয়া মহাজনের মুখের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে তিনি কহিলেন, "মহাশয়! বেশ-পরিবর্ত্তনে আকৃতির কতকটা পরিবর্ত্তন হয়, সেই কারণে আমার ভ্রম হইতেছিল, এখন আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, আপনিই সেই ঘোড়সওয়ার। আপনার কপালের বামদিকে ঐ যে লোহিতবর্ণ আঁচিলটী আছে, ঐটী না থাকিলে মুখের আকৃতি দেখিয়া হয় ত আমি আপনাকে সেই ঘোড়সওয়ারের সহোদর বলিয়া স্থির করিতে পারিতাম, এখন আর কোন সংশয় থাকিতেছে না; ঐ আঁচিল আমার সংশয় ভঞ্জন করিল;—আপনিই সেই ঘোড়সওয়ার।"

সদানন্দ বাবুর কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল; ব্যাপার কি, জানিবার জন্য উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি দুটী তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাজনকে উত্তর দিতে হইল না, সংক্ষেপে স্পষ্ট স্পষ্ট বাক্যে নায়েব মহাশয় ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন।

ব্যাপার বুঝিয়াও সদানন্দ বাবুর অন্তরের কৌতূহল পূর্ণাংশে পরিতৃপ্ত হইল না, তিনি পূর্ণব্যাখ্যা চাহিলেন।

অতি অল্পকথায় পূর্ণব্যাখ্যা হইয়া গেল, তাহার পর তিনজনে চুপি চুপি পরামর্শ। মনে মনে মহাজনের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া সদানন্দ বাবু বিশেষ গৌরব করিয়া বলিলেন, "আপনার পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। আপনি আমাদের অকারণ মিত্র; কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আপনি আমাদের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, আপনাকে শত শত ধন্যবাদ।"

মহাজনের আদর-বৃদ্ধি হইল, বাবু তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন, "দুই মাস আপনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কাছারীতে অবস্থান করিতে হইবে। আমি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কল্যই পত্র লিখিব, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তিনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

মহাজন বলিলেন, "অবস্থানের প্রয়োজনই হইবে, মহানন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করাও আবশ্যক হইবে, কিন্তু অবিচ্ছেদে বেশীদিন আমি এখানে বাস করিতে পারিব না। বুঝিতেছেন, নানা স্থানে আমাকে ভ্রমণ করিতে হইবে, নানা বিষয়ের সন্ধান লইতে হইবে, নানা প্রকার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, আমি একস্থানে আবদ্ধ থাকিলে, সুচারুরূপে কার্য্য সাধন হইবে না। মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে যাইব, মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া থাকিব, এই পর্য্যন্ত আমার কথা;—এই পর্য্যন্ত আমার অঙ্গীকার।"

এ অঙ্গীকারের উপর সদানন্দ বাবুর আর কোন কথা

থাকিল না, তাহাতেই তিনি সম্মত হইলেন। অল্পক্ষণের আলাপে গোপেশ্বরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল, বন্ধুত্বের সহিত ভক্তি-শ্রদ্ধার সংযোগ; প্রাচীন নায়েব মহাশয় তাঁহাকে ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিয়া দপ্তরখানায় লইয়া গেলেন।

বাবুর শয়নকক্ষের পার্শ্বকক্ষে মহাজনের শয়নের জন্য সুন্দর শয্যা প্রস্তুত হইল, সামাদানে বাতী জ্বলিতে লাগিল, একজন চাকর সেই ঘরের এক ধারে শয়ন করিয়া রহিল। মহাজনের যদি নিদ্রাভঙ্গ হয়, কোন কার্য্যের যদি আবশ্যক হয়, চাকরকে ডাকিলেই সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আদেশ পালন করিবে, চাকরের প্রতি বাবুর এইরূপ অনুজ্ঞা রহিল।

রজনী-প্রভাতে শতাধিক মজুর ও ঘরামী আসিয়া বাঁশ কাটিতে আরম্ভ করিল; রাশি রাশি বাঁশ আসিয়া প্রশস্তক্ষেত্রে পড়িতে লাগিল; গরানের খুঁটী, গরানের ছিটা রাশীকৃত হইল; পাটের দড়ী, শোণের দড়ী, নারিকেলের দড়ী অনেক জমা হইল, নূতন নূতন ঘর বাঁধিবার আয়োজন হইতে লাগিল।

বলা হইয়াছে, কাছারী-বাড়ীখানি যেন একটী দ্বীপ; চারিদিকে তৃণশূন্য ক্ষেত্র যেন সমুদ্র; সমুদ্রের বেলাভূমি যেরূপ দূরে দূরে প্রজালোকের ঘরগুলি সেইরূপ হইয়া ছিল; গায়ে গায়ে ঘর নয়, মধ্যে মধ্যে ব্যবধান; সেই সকল ব্যবধানস্থান পূর্ণ করিয়া চারিদিকেই নূতন নূতন ঘর বাঁধা হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত।

মহাজন যখন আসিয়াছিলেন, তখন পৌষমাসের অর্দ্ধেক দিন বাকী; সেই অর্দ্ধেক দিনের মধ্যে প্রায় সমস্ত নূতন ঘর নির্ম্মিত হইয়া গেল। নূতন ঘরে মাটীর দেয়াল দেওয়া হইল না, সমস্তই বাঁশের বেড়া ও গরানের বেড়া। সাবেক ঘরগুলির

মধ্যেও বেড়ার ঘর বেশী ; বেড়াগুলি মাটী দিয়া লেপা ছিল, সে সকল মাটী চাঁচিয়া ফেলা হইল, সকল ঘরেই বিচালী-খড়ের ছাউনী ; ছাউনীর ভিতরে ভিতরে নানা প্রকার নূতন জিনিস রক্ষা করা হইল ; অনেক লোক লাগিয়াছিল, মকর-সংক্রান্তির পরদিন আর একখানি ঘরও ছাওয়া হইতে বাকী রহিল না। সমস্তই ঠিকঠাক। কাছারীবাড়ী যেন এক রাজার কেল্লা ; ঘরগুলি যেন সেই কেল্লার পরম সুন্দর পরিখা।

মাঘমাসের প্রথমেই কাছারী-বাড়ীতে প্রজালোকের আম্‌দানী। গোপেশ্বরের পরামর্শে সদানন্দ বাবু সমস্ত প্রজাকে বলিলেন, "দূরে দূরে তোমাদের যাহার কুটুম্ববাড়ী আছে কিম্বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী আছে, সংসারের জিনিসপত্র লইয়া একমাসের জন্য তোমরা সপরিবারে সেই সকল স্থানে চলিয়া যাও ; তোমাদের সঞ্চিত ধান্য ও বিচালী আমাদের লোকেরা নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিবে। একমাস পরে ফিরিয়া আসিয়া তোমরা আবার নূতন সংসারাশ্রম পত্তন করিতে পারিবে।"

কারণ বুঝিতে না পারিয়াও প্রজালোকেরা জমিদারের আদেশ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পৌষমাসের পর ধান্যপ্রধান দেশের ধান্যক্ষেত্রগুলি পরিষ্কার হয়, ক্ষেত্রের উপর দিয়া গরুড় গাড়ী চলে, প্রজারা আপনাদের জিনিসপত্র গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চালান করিল, আপনারাও আপনাদের আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ীতে চলিয়া গেল। প্রজাদের সমস্ত ঘর শূন্য হইয়া রহিল।

পূর্ব্বকথিত বিলাসপুর যেমন ঐ জমিদারদিগের জমিদারীর অন্তর্গত, দূরে নিকটে সেই প্রকারের আরও অনেক গ্রাম তাঁহা-

দের এলাকাভুক্ত। যে সকল প্রজা তৈজস-পত্রাদি লইয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়া গেল, তাহাদিগের গোলা ও খামারের ধান্যগুলি কাছারীর লোকেরা সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের কাছারীতে ও বড় বড় গৃহস্থের বাড়ীতে রওনা করিয়া দিল; বিচালীও গাড়ী বোঝাই করিয়া সেই সকল স্থানে পাঠাইল। সদানন্দ বাবু নিশ্চিন্ত হইলেন।

মাঘমাসের দশম দিবসে মহানন্দ বাবু উপস্থিত হইলেন; গোপেশ্বরের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। গত বৎসরের সেই ঘোড়সওয়ার এই গোপেশ্বর, ইহা অবগত হইয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। সদানন্দ বাবুর সহিত গোপেশ্বরের যেরূপ পরামর্শ, তাঁহা শ্রবণ করিয়া মহানন্দ বাবুর বিস্ময় জন্মিল, বিস্ময়ের সহিত আনন্দ।

গোপেশ্বর মধ্যে মধ্যে এক একদিন অপরাহ্নে কাছারী হইতে কোথায় চলিয়া যান, কোন দিন রাত্রেই ফিরিয়া আসেন, এক একবার দুই একদিন বিলম্ব হয়; কোথায় যান, কি করিয়া আইসেন, বাবুরা তাহা কিছুই জানিতে পারেন না।

ক্রমেই দিন গত হইতে লাগিল। মাঘমাসের বিংশতিদিন অতীত। বাবু মহানন্দ, সদানন্দ, গোপেশ্বর ও নায়েব চারিজনে বসিয়া একরাত্রে বলাবলি করিতেছেন, "বোধ হয়, তাহারা কোন সূত্রে কিছু জানিতে পারিয়াছে, বোধ হয়, তাহারা এ বৎসর এ মাসে এখানে দেখা দিবে না, আমাদের অপেক্ষাও তাহারা সতর্ক, তাহাদের বুদ্ধির নিকটে বড় বড় চতুর দারোগারাও পরাজয় স্বীকার করেন।"

গোপেশ্বর বলিলেন, "তাহাদের লোভ অধিক। আমাদের

সতর্কতার কোন সূত্র যদি তাহারা ধরিতে পারিয়া থাকে, তাহা মন্দ হয় নাই। মাঘমাসের জন্য আমরা সতর্ক হইয়াছি, অন্যমাসে আমরা অসতর্ক থাকিব, ইহাই তাহারা জানিয়াছে, তাহার অধিক আর কিছুই জানিতে পারে নাই। একগাছি সূত্রে আমাদের মন্ত্রণা ঝুলিতেছে না, বহুসূত্রে বৃহৎ জাল প্রস্তুত করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র মক্ষিকা হইতে বৃহৎ ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত সেই জালে বাঁধা পড়িবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস। মাঘমাস ফুরাইয়া গেলেই সে জালের শক্তি কমিয়া যাইবে, এমন আমি বিবেচনা করি না।"

নায়েব মহাশয় কহিলেন, "মাঘমাসের এখনও দিন আছে। নিত্য নিত্য সজাগ থাকিয়া আমরা তাহাদের দর্শন প্রতীক্ষা করিতেছি, ইহা তাহারা অবগত নহে। এই রকমে যদি মাঘ-মাস কাটিয়া যায়, তাহাতেই যে তাহারা ততটা লোভ সংবরণ করিবে, এমন বিশ্বাস হয় না। আক্রমণটা তাহারা বার্ষিক কার্য্যের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে; বৎসর যতদিন না ফুরায়, ততদিন তাহাদের আশা ফুরাইবে না। আমি যেন বুঝিতে পারিতেছি, তাহারা আমাদের অসতর্কতা অন্বেষণ করিতেছে।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, কি একটু চিন্তা করিয়া গোপেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাছারীতে সরস্বতী-পূজা হয়?"

নায়েব মহাশয় উত্তর করিলেন, "হয়;—প্রতিমা হয় না, মস্যাধার লেখনী প্রভৃতি পূজা হইয়া থাকে।"

গোপেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৎসর কোন্ তারিখে সরস্বতী-পূজা?"

নায়েব মহাশয় কহিলেন, "সংক্রান্তির দিবস।"

গোপেশ্বর বলিলেন, "তবে ত এখন দশদিন বিলম্ব; আপ

আয়োজন করুন। নিকটে যদি প্রতিমা পাওয়া যায়, একখানি আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করুন। বাবুরা উভয় সহোদরে উপস্থিত আছেন, ঘটা করিয়া পূজা করা হউক্। আপনাদের এখানে চড়ক-সন্ন্যাসের সময় যে গাজন হয়, তাহা অতি চমৎকার। গত বৎসর গাজনের সময় আমি এ অঞ্চলে উপস্থিত ছিলাম, তাহা আপনারা বুঝিয়াছেন। গাজনে যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাদের ভিতর অনেক ডাকাত। তাহাদের নৃত্য, লম্ফন, কুন্দন, লাঠিবাজী, ক্রীড়া-কৌশল ও অসমসাহসিকতা দর্শন করিয়া আমি বুঝিয়াছি, তাহারা কাঁচা নয়। অনেকের মুখ-চক্ষু দর্শন করিয়াও আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাহারা পাকা খেলোয়াড়। সরস্বতী-পূজার রজনীতে তাহাদিগকে আপনি নিমন্ত্রণ করিবেন, তাহারা মল্লক্রীড়া দেখাইবে। মল্ল-যুদ্ধে তাহাদের বিলক্ষণ দক্ষতা আছে, তাহাও আমি বুঝিয়াছি। যাহারা আসিবে, এখানে তাহারা উপস্থিত হইলে বাছিয়া বাছিয়া আমি চিনাইয়া দিব। তাহাই আপনি করুন।"

নায়েব মহাশয় কহিলেন, "গাজনের সন্ন্যাসী একত্র করা কঠিন হইবে না, কিন্তু প্রতিমা নিকটে প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। এ সকল চাষালোকের দেশ, এ অঞ্চলে কেহই প্রতিমা গড়ে না, প্রতিমা আনাইতে হইলে সহর অঞ্চলে লোক পাঠাইতে হইবে।"

গোপেশ্বর কহিলেন, নিকটে যদি না পাওয়া যায়, তবে আপনি এক কাজ করুন। কাঠামো প্রস্তুত করিতে দিন। যে মৃত্তি-কায় পুতুল প্রস্তুত হইয়া থাকে সেইরূপ মৃত্তিকা সংগ্রহ করুন। বাজারের দোকানে অবশ্য নানা প্রকার রং পাওয়া যাইবে, সেই সকল রং আনাইয়া লউন, আমি প্রতিমা গড়িতে পারি।

মাটীর গহনা পরাইয়া আমি নিজেই প্রতিমা সাজাইয়া লইব। পদ্মফুল দিয়া সাজাইলে মা সরস্বতীর আর অন্য সজ্জা প্রয়োজন হইবে না।”

বাবুরা হাস্য করিলেন। গোপেশ্বর কহিলেন, “হাস্যের কোন কারণ নাই, যাহা আমি বলিলাম, তাহাই আমি করিব। আপনারা আয়োজন করুন্।”

আয়োজন হইল। গোপেশ্বর স্বহস্তে প্রতিমা গড়িলেন, আপনি রং দিলেন, আপনি চিত্র করিলেন, আপনি সাজাইলেন। দুই পার্শ্বে দুটী সখী, মধ্যস্থলে পদ্মাসনে বীণাপাণি।

দশ দিন থাকিতে প্রতিমা-গঠন আরম্ভ হইয়াছিল, সংক্রান্তির দুই দিন থাকিতে সমাপ্ত হইল। দপ্তরখানার একটী ঘর পরিষ্কার করিয়া, সেই ঘরের মধ্যস্থলে চৌকী পাতিয়া, প্রতিমাস্থাপন করা হইল। পূজার আর দুইদিন বাকী।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

সরস্বতীপূজার দুই দিন বাকী। আয়োজনের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সেই দুই দিনে তৎসমস্তই ঠিক হইল। গাঁজনের সন্ন্যাসিগণকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, পূজার পূর্ব্বদিন বৈকালে তাহারা কাছারীতে আসিয়া হাজির হইল। গণনায় পঞ্চাশ জন। গোপেশ্বরবাবু তাহাদিগকে সারিবন্দী করিয়া দাঁড় করাইলেন। বাবুরা দুই সহোদর, কাছারীর আমলাবর্গ, ভৃত্যবর্গ, দেউড়ীর দ্বারপালবর্গ সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত।

গোপেশ্বরবাবু সেই সকল সমবেত সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন; একভাগে কুড়িজন, অন্যভাগে ত্রিশজন। যে ভাগে কুড়ি, সেই ভাগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাছারীর একজন মুহুরীকে আপনি নিকটে ডাকিলেন, দোয়াত, কলম, কাগজ আনিতে বলিলেন, মুহুরী প্রস্তুত হইল।

কুড়িজন সন্ন্যাসীর প্রত্যেকের নাম, বয়স, পিতার নাম, পেশা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, গোপেশ্বরবাবু পার্শ্বস্থ মুহুরীকে সেই সকল কথা লিখিয়া লইতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসীরা যেমন যেমন বলিল, মুহুরী শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার অক্ষরে সেইরূপ সেইরূপ লিখিয়া লইল। অন্য শ্রেণীতে যে ত্রিশজন ছিল, তাহাদের নাম লেখা হইল না। গোপেশ্বরবাবু তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা এখন গৃহে যাইতে পার, কল্য যখন ক্রীড়া হইবে, তখন তোমরা আসিয়া দর্শন করিতে পারিবে।" তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ঐ কুড়িজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা মল্লযুদ্ধ করিতে পার?" তাহারা প্রত্যেকেই উত্তর করিল, "যুদ্ধ আমরা কখনও করি নাই; সময়ে সময়ে আমোদ করিয়া আপনা আপনি কুস্তি করিয়া থাকি।"

গোপেশ্বরবাবু বলিলেন, "কুস্তি আর যুদ্ধ একই কথা। তোমরা আপনা আপনি কুস্তি কর, কল্য রাত্রে আমি তোমাদের পরীক্ষা দেখিব; প্রতিদ্বন্দ্বী মিলাইয়া দিব। এই কাছারীর পাইকেরা ও দরোয়ানেরা সকলেই কুস্তি জানে। আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমরাও অনেক রকম খেলা জানো। অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না, লাঠী চালাইতে হইবে না, মল্লযুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র

আবশ্যক হয় না; হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া বল পরীক্ষা করা হয়, কৌশল পরীক্ষা করা হয়। তাহাই আমরা দেখিব। যে যেমন যোগ্য, সে সেইরূপ পুরস্কার পাইবে।"

নমস্কার করিয়া সন্ন্যাসীরা সম্মত হইল। তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইল না, বাবুরা তাহাদিগকে সে দিন সে রাত্রি কাছারী-বাড়ীতেই স্থান দিয়া রাখিলেন। রাত্রিকালে গোপেশ্বরবাবু তাহাদিগকে অনেকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা চাপা চাপা কথায় কতক প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল, কতক প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই। "আজ্ঞে, না, জানি না, মনে হয় না," ইত্যাদি ছোট ছোট কথায় অনেক প্রশ্ন তাহারা এড়াইয়া দিয়াছিল। গোপেশ্বরবাবুর সঙ্গে তাহাদের যখন কথা হয়, বাবুরা অথবা আমলারা কেহই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

পরদিন শ্রীপঞ্চমী। বৎসর বৎসর সরস্বতীপূজার দিন কাছারীতে দোয়াত-পূজা হয়; শুভ পুণ্যাহের দিন ঠাকুর-পূজা হয়; একজন পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট আছেন। সেই পুরোহিত আসিয়া পুষ্প-চয়নাদি কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সরস্বতী-পূজা করিলেন। অনেক প্রজার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, নিজগ্রামের ও নিকট-বর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি শত শত প্রজা সমাগত হইয়া ভোজন করিল। নিজগ্রামের যে সকল প্রজা কুটুম্ববাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল, পূজার দিন তাহারাও আসিয়া মা সরস্বতীর ভোগের প্রসাদ পাইল। দিনমান এই প্রকারে কাটিয়া গেল, রাত্রিকালে মল্লযুদ্ধ। এক এক জনের সহিত এক এক জনের কুস্তি। কাছারীতে তখন পাইক-দরোয়ানের সংখ্যা অধিক ছিল, পাঁচজনের সন্ন্যাসিদলের কুড়িজনের সহিত কুড়িজন পাইক-

দরোয়ানের বল পরীক্ষা করা হইল। গাঁজনের মল্লেরা কোন কোন খেলায় জিতিল, কোন কোন খেলায় হারিল; কিন্তু হারিয়াও তাহারা অবসন্ন হইল না। গোপেশ্বরবাবু তাহাদিগকে বলিলেন, "কাছারীর প্রাচীর বিংশতি হস্ত উচ্চ; লাঠির উপর ভর রাখিয়া এই প্রাচীর যদি তোমরা উল্লঙ্ঘন করিতে পার, পাঁচ টাকা করিয়া বক্সীস পাইবে।" একজন মল্ল বলিল, লাঠী সচরাচর চারি হস্তের অধিক দীর্ঘ হয় না; লাঠীতে ভর দিয়া বিংশতি হস্ত ঊর্দ্ধে লম্ফ দেওয়া অসাধ্য। বড় বড় বাঁশের উপর ভর রাখিয়া আমরা হুজুরের হুকুম তামিল করিতে পারি।"

বড় বড় বাঁশ তৎক্ষণাৎ আনিয়া দেওয়া হইল, কুড়িজন মল্ল দুই তিনবার করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিল; একবার লম্ফ দিয়া বাহিরে পড়ে, বাহির হইতে লম্ফ দিয়া পুনরায় ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হয়। মল্লগণের এই অদ্ভুত ক্রীড়া দর্শন করিয়া দর্শক-মণ্ডলী আশ্চর্য্যান্বিত হইল; গোপেশ্বরবাবুও চমৎকৃত হইলেন।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় ক্রীড়া-ভঙ্গ হইল। গোপেশ্বর বলিলেন, "কয়েক দিবসের পরিশ্রমে সকলে অত্যন্ত ক্লান্ত আছে, আজি আর অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরণ করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে; সকলে বিশ্রাম করুক্, আমরাও বিশ্রাম করি।"

বাবুদের সম্মতিতে সেই পরামর্শই স্থির হইল। অতঃপর মল্লগণকে একটী স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া গিয়া গোপেশ্বরবাবু কি কি কথা বলিলেন, তাহাদের মুখে কি কি শুনিলেন, তাহারা আর সে রাত্রে কাছারীবাড়ী হইতে বাহির হইল না, সেইখানেই শয়ন করিয়া রহিল।

যে সকল প্রজা নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জন কতক মণ্ডল-প্রজাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া গোপেশ্বরবাবু কতকগুলি উপদেশ দিয়াছিলেন, অপরাপর প্রজার সহিত তাহারা সকলেই কাছারী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাছারীর সকলেই যথানিয়মে শয়ন করিলে, বাবুরাও শয়ন করিলেন; গোপেশ্বরবাবু শয়ন করিলেন না। উপরের একটী ঘরে একখানি চৌকীর উপর তিনি বসিয়া রহিলেন। যে দিকে রাস্তা, সেইদিকে একটী জানালা। জ্যোৎস্না-রাত্রি হইলে সেই জানালা দিয়া বাহিরের বস্তু বেশ দেখা যায়; কিন্তু শ্রীপঞ্চমীর রজনীতে চন্দ্রদেব অধিকক্ষণ আকাশে ছিলেন না, রাত্রি দশ দণ্ডের সময় অস্ত গিয়াছিলেন, অন্ধকার হইয়াছিল। গোপেশ্বরবাবু যে ঘরে বসিয়া ছিলেন, সে ঘরেও আলো রাখিতে দেন নাই; সমস্ত আলো নির্ব্বাণ করা হইয়াছিল; অন্ধকারেই তিনি গবাক্ষপথে চক্ষু দিয়া অন্ধকার আকাশ দর্শন করিতেছিলেন।

বাড়ীর সদর-দরজা বন্ধ করা হইয়াছিল, দরোয়ান-পাইকেরা শয়ন করিয়াছিল, কাছারীবাড়ীর সকল দিকেই অন্ধকার। এইখানে বলা আবশ্যক, নিত্য নিত্য যাঁহারা দপ্তরখানায় শয়ন করেন, সে রাত্রে তাঁহারা উপরের চকের ভিন্ন ভিন্ন গৃহে শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, দপ্তরখানা শূন্য পড়িয়াছিল। যে ঘরে সরস্বতী-প্রতিমা, সে ঘরে লোকজন থাকিবার কথা নয়, প্রতিমা চৌকা দিবার লোক কেহ ছিল না। পূজার ঘরে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলে, কিন্তু ঐ কাছারীবাড়ীর সরস্বতী-প্রতিমাকে রাত্রি দেড় প্রহরের পর অন্ধকারে রাখা হইয়াছিল। বাবুরা যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, সে ঘরে একটী বসা সেজে বাতী জ্বলিতেছিল,

কিন্তু ঘরের জানালা-দরজা সমস্তই বন্ধ, বাহির হইতে সেই বাতীর আলো দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে ঘরে গোপেশ্বর, সেই ঘরের পূর্ব্বদিকে বাবুদের শয়নঘর। মধ্যস্থলের দরজাটী ভেজাইয়া রাখা হইয়াছিল, প্রয়োজন বুঝিলে গোপেশ্বর সেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন, সেই কল্পনায় সে দরজা বন্ধ করা হয় নাই।

রাত্রি দুই প্রহর। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। গোপেশ্বর সমভাবে বসিয়া আছেন। ক্ষেত্র-পথে লোক চলিয়া গেলে ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করা যায়, কেহ কোন দিকে যাইতেছে কি না, কোন দিক্ হইতে কেহ সেই দিকে আসিতেছে কি না, অন্ধকারে একাকী বসিয়া সুস্থির-নয়নে গোপেশ্বর তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন। লোক-চলাচলের কোন লক্ষণ তিনি জানিতে পারিলেন না।

রাত্রি আড়াই প্রহর অতীত। কোন দিকে কেহই নাই, গোপেশ্বরবাবু মনে মনে ভাবিতেছেন, সকল কথাই কি তবে মিথ্যা? আজ কি তাহারা আসিবে না? এতটা যোগাড়-যন্ত্র সমস্তই কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তাহারা কি আমাদের পূর্ব্ব-সাবধানতা জানিতে পারিয়াছে? কোন সূত্রে কি তাহারা আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা শুনিতে পাইয়াছে?—তাহাও ত অসম্ভব। এ রাত্রে কাছারী হইতে যাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে, আমাদের আসল সংকল্প তাহারা কেহই কিছু জানে না, জানিবার সম্ভাবনাও নাই। মণ্ডল-প্রজাগণকে যাহা বলিয়া দেওয়া গিয়াছে, সে সকল কথার সহিত কাছারীবাড়ীর সম্বন্ধ নিতান্তই অল্প। তাহারা যাহা করিবে, তাহা বাহিরের কার্য্য; কি জন্য সে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। তবে কি প্রকারে

সূত্র বাহির হইবার সম্ভাবনা ? মল্লেরা একপ্রকার বশীভূত হইয়াছে, তাহাদের কেহ বাহির হইয়া যায় নাই, যে গৃহে তাহারা আছে, সে গৃহের বহির্দ্বারে চাবীবন্ধ করা হইয়াছে। চাবীবন্ধ করিবার পূর্ব্বে আমি স্বয়ং গণনা করিয়া দেখিয়াছি, ঠিক কুড়ি জন। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি বাহির হইতে পারিত, তাহা হইলে বরং সূত্র প্রকাশ হইবার কিঞ্চিৎ আশঙ্কা থাকিত। সে আশঙ্কা নাই। তবে কেন তাহারা এখনও পর্য্যন্ত দেখা দিতেছে না ? বাবুদের কাছে আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা পালন করিতে পারিব, এইরূপ আমার বিশ্বাস। কিন্তু শীকার প্রাপ্ত না হইলে শীকারী কি করিতে পারে ?

গোপেশ্বরের মনে এইরূপ চিন্তা ;—নানা তর্ক-বিতর্কের সহিত নানা প্রকার চিন্তা। চিন্তায় চিন্তায় আরও দুই দণ্ড অতিক্রান্ত। কোন দিকে কোন সাড়া-শব্দ নাই। কাছারীবাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন গৃহে যাহারা শয়ন করিয়াছে, তাহারা নিদ্রিত কি জাগরিত, বাবুরা দুই সহোদরে জাগ্রত কি নিদ্রিত, গোপেশ্বরবাবু তাহা জানিতে পারিতেছেন না। অন্যদিকে তাঁহার মন নাই, অন্যদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। জাহাজের কম্পাশের কাঁটা নিরন্তর যেমন ঠিক উত্তরদিকে থাকে, তাঁহার চক্ষুও ঠিক সেই ভাবে অবিচ্ছেদে সেই ক্ষেত্র-পথের দিকে ;—তাঁহার মনও সেই দিকে।

হঠাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে ঢোলক, মন্দিরা ও বেহালার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সেই বাদ্যধ্বনির সঙ্গে কতিপয় লোকের কণ্ঠ-সঙ্গীতধ্বনি মিশ্রিত। ধ্বনি অনেকটা দূর হইতে আসিতেছে, গোপেশ্বরবাবু এইরূপ স্থির করিলেন, সেই দিকে চক্ষু ফিরাইয়া সেই দিকেই কাণ পাতিয়া রহিলেন।

যন্ত্রধ্বনির সহিত মানুষের কণ্ঠধ্বনি ক্রমশই নিকটে। কাছারীর দিকেই সেই মিলিতধ্বনি অগ্রসর হইতেছে, গোপেশ্বরবাবু তাহা বুঝিলেন। অল্পক্ষণমধ্যে কতিপয় মনুষ্যের ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-গোচর হইল, গীতের বাক্যগুলিও স্পষ্ট স্পষ্ট তাঁহার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল। ক্রমশই অগ্রসর। কাছারীর নিকটবর্ত্তী হইলে গোপেশ্বরবাবু দেখিলেন, অন্ধকারেই গণনা করিলেন, আটজন। বাবুদের কাছারীতে সরস্বতী-পূজা হইয়াছে, তাহা শুনিয়াই কি উহারা কাছারীতে গান করিতে আসিতেছে? প্রথমতঃ এই তর্ক তাঁহার মনে উঠিল; পরক্ষণেই সে তর্ক দূর হইয়া গেল;—লোকেরা কাছারীর সম্মুখ দিয়া উচ্চকণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে সরাসর দক্ষিণমুখে চলিয়া গেল। অন্ধকারেই আসিতেছিল, অন্ধকারেই অদৃশ্য হইল। গীত-বাদ্য আর শুনা গেল না।

একটু পরে আর এক দিক্ হইতে আর এক দল। সে দলে গোপীযন্ত্র বাজিতেছিল, দলের লোকেরা বাউলের সুরে গীত গাহিতেছিল। কাছারীর নিকটে আসিলে গোপেশ্বরবাবু দেখিলেন, বারোজন বাউল। তাহারাও পূর্ব্বোক্ত দলের ন্যায় দক্ষিণ-মুখে চলিয়া গেল, কাছারীর কাছে দাঁড়াইল না।

আবার অর্দ্ধ দণ্ড পরে তৃতীয় দল। তাহারা খোল, করতাল ও রামশিঙ্গা বাজাইয়া হরি-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কাছারীর নিকটে আসিল। তাহাদের দলে অনেক লোক। দলের অগ্র-পশ্চাতে দুই দুই জনের হস্তে চারিটা প্রজ্বলিত মশাল; মশালের অগ্রে অগ্রে চারি চারি জনের হস্তে হরিনাম-লেখা রক্তবর্ণ পতাকা। সে দলটীও কাছারীর সম্মুখ দিয়া খানিক দূর দক্ষিণ-

মুখে গিয়া পূর্ব্বদিকে বক্রগতি ধরিল। খোল-করতালের বাদ্য-ধ্বনি অনেকদূর যায়, কীর্ত্তনের সুরও অনেকদূর হইতে শুনা যায়; খানিকক্ষণ শুনা গেল, তাহার পর অল্পে অল্পে বাতাসের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। গোপেশ্বরবাবু আর কিছু শুনিতে পাইলেন না। আবার অন্যদল আইসে কি না, তিনি তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অন্যদল আসিল না। গোপেশ্বরবাবু মনে করিলেন, তিন ভাগে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাহারা আনন্দ জানাইয়া গেল, তাহারাই তাহারা। এই পথে যদি আবার ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলেই কার্য্যসাধন করিবার অবসর অন্বেষণ করিবে, কিন্তু অঙ্গহীন হইয়াছে, সে অঙ্গ কোথায়, তাহারই অন্বেষণে উহারা এইরূপে ঘুরিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই অঙ্গ কোথায় গুপ্তভাবে কোন্ গুপ্ত-গৃহে অন্ধকারে চাবী-বন্ধ আছে, সে সন্ধান তাহারা পাইবে না। লাঙ্গুলে পদাঘাত করিলে সর্প যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া ফণা বিস্তার করে, আঘাতকারীকে দংশন করিবার জন্য যেমন মহাক্রোধে গর্জ্জন করে, অঙ্গহারা হইয়া উহারাও সেইরূপে গর্জ্জন করিতে করিতে অধিক পরাক্রম প্রকাশ করিবে, ইহাই বুঝা যাইতেছে। ফণা বিস্তার করুক্, যত পারে গর্জ্জন করুক্, যত পারে পরাক্রম দেখাক্, মন্ত্রৌষধির নিকটে নিশ্চয়ই মাথা হেঁট করিতে হইবে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, আর তাহারা অধিক বিলম্ব করিবে না, এই সময় হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকা আবশ্যক। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া গোপেশ্বরবাবু প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

সপ্তম কাণ্ড।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। বাবুরা যে ঘরে শয়ন করিয়া ছিলেন, সেই ঘরের দরজা ঠেলিয়া গোপেশ্বরবাবু ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়াই পূর্ব্ববৎ সেই দরজা ভেজাইয়া দিলেন। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। যে শয্যায় বড়বাবু, সেই শয্যার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাগিয়া আছেন কি?" শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বাবু উত্তর করিলেন, "পরামর্শ আমি ভুলি নাই। রাত্রি অধিক হইয়াছে, বোধ হয়, আজ আর কোন উপদ্রব হইবে না।"

ছোটবাবুও উঠিয়া বসিলেন। তিনি কহিলেন, "উপদ্রব হইবার সময় অতীত হয় নাই।"

গোপেশ্বরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইতিপূর্ব্বে কোন প্রকার বাদ্যধ্বনি আপনারা শুনিতে পাইয়াছেন কি?"

প্রশ্নচ্ছলে উভয়েই উত্তর করিলেন, "শুনিয়াছি; বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গীতধ্বনি। কিসের বাদ্য? কিসের সঙ্গীত?"

গোপেশ্বরবাবু উত্তর করিলেন, "সময় হইয়াছে, গীতবাদ্যের সঙ্কেতে তাহাই তাহারা জানাইয়া গেল। বাড়ীর কেহ জাগিয়া আছে কি না, ঐ কৌশলে তাহাই জানিয়া গেল। একদল যেন সখের গায়ক, একদল বাউল, একদল সংকীর্ত্তনওয়ালা; এই তিন দল।"

সদানন্দবাবু কহিলেন, "আপনার অনুমান যথার্থ। বাদ্য বাজাইয়া, গীত গাহিয়া, তাহারা পরীক্ষা করিতেছিল, কাছারীতে

যদি কেহ জাগিয়া থাকে, দরজা খুলিয়া গীত শুনিতে বাহির হইবে, সেই অবসরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবে কিম্বা হয় ত আজিকার মত ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তাহারা ভাবিয়াছিল।"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "তাহা তাহারা ভাবে নাই। প্রথমে আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য হইতে পারে, জাগ্রত লোকেরা গীত শুনিতে বাহির হইবে, ইহা তাহারা ভাবিতে পারে, কিন্তু বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার কিম্বা হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার কল্পনা তাহাদের মনে উদিত হয় নাই। তাদৃশ লোকের বুকের পাটা কতদূর, তাহাদের ফন্দীফিকিরের দৌড় কতদূর, আপনাদের অপেক্ষা আমি তাহা বেশী জানি। আমার ফন্দীফিকিরের কাছে আজ তাহাদের ফন্দীফিকির ভাসিয়া যাইবে, মুক্তনেত্রে তাহা আপনারা দেখিবেন। রাত্রি আর অধিক নাই, তিন প্রহর গত হইয়া গিয়াছে, আপনারা আর শয়ন করিবেন না। সতর্ক করিবার জন্য আমি আসিয়াছিলাম, চলিলাম।"

বাবুদের ঘরের এক কোণে দুটী বন্দুক দাঁড় করানো ছিল, সেই দুটী বন্দুক হস্তে লইয়া গোপেশ্বরবাবু সে ঘর হইতে বাহির হইলেন; দরজা পূর্ব্ববৎ ভেজাইয়া রাখিলেন। বন্দুক দুটী সাবধানে রাখিয়া দ্বিতীয় গৃহের দ্বারদেশে তিনি তখন সাবধান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সচরাচর বাবুলোকের যেমন পোষাক হয়, সেই রকম পোষাক পরা, মাথায় তাজ, মুখে পরচুল, গালপাট্টা; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, ঘোড়সওয়ারের বেশ। কিং বীর-পুরুষেরা অঙ্গাবরণের মধ্যে যেমন বর্ম্ম পরিধান করে

গোপেশ্বরবাবুর পোষাকের ভিতরে সেইরূপ বর্ম্ম ছিল। বাহির হইতে তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না।

বীরবেশে গোপেশ্বরবাবু দরজা চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া মনুষ্য-পতনের শব্দ হইল, সদর-দরজা খোলা শব্দ হইল, বহুলোকে হল্লা করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্ধকার বাড়ী অসংখ্য মশালের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জনকতক লোক দপ্তরখানায় প্রবেশ করিয়া, সিন্দুক-বাক্স ভাঙ্গিবার চেষ্টায় কুঠারাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। গোপেশ্বরবাবু সেই সময় নির্ভয়ে শূন্য-হস্তে নিম্নতলে নামিয়া দপ্তরখানার সম্মুখে গিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আপনারা আসিয়াছেন, মাসের মধ্যে আসেন নাই, আমার উদ্বেগ হইয়াছিল। আজ সংক্রান্তি, আমাদের সরস্বতী-পূজা, আপনারা এখানে কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করিবেন না, হাত নাগাইদ কৈফিয়ৎ কাটিয়া যত টাকা জমা হইয়াছে, সমস্তই আমি আপনাদের জন্য রাখিয়াছি; আপনারা টাকা চান, নীচের ঘরে একটীও টাকা নাই, কেন আপনারা পরিশ্রম করিয়া ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করিবেন? বিনা ক্লেশে যদি আপনাদের আশা পূর্ণ হয়, বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? আপনাদের দলপতি মহাশয় কোথায়? তাঁহাকে আমি বলিব, সিন্দুক-বাক্স চেলা করিবেন না, একটী প্রাণীর অঙ্গেও আঘাত করিবেন না, কাছারীতে যত টাকা মজুত আছে, সমস্তই আমি এই দণ্ডে আপনাদিগকে অর্পণ করিব।"

দলপতি অনেকগুলি। তাহাদিগের মধ্যে চারিজন গোপে-

৭ শ্বরবাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল, "অঙ্গীকার

পালন কর, আমরা নিঃশব্দে চলিয়া যাইব, অঙ্গীকার যদি ভঙ্গ কর, একজনকেও ছাড়িব না, সকলকে মূলকুচি করিয়া সমস্ত ভাণ্ডার লুটিয়া লইব।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া গোপেশ্বরবাবু বলিলেন, "অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে আমি শিক্ষা করি নাই, সত্য বলিতেছি, দপ্তরখানায় অথবা নিম্নতলের কোন গৃহে আজ আমি একটী পয়সাও রাখি নাই, সমস্তই উপরে লইয়া রাখিয়াছি, পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক হইবে ; এক পয়সাও আমি লুকাইয়া রাখিব না। দেখিতেছি আপনারা ভদ্রলোক,—বাবুলোক, সমস্তই আজ আমি আপনাদিগকে অর্পণ করিব। আপনারা এই উঠানে সারি গাঁথিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ান, আমি উপরে যাই, উপরের বারাণ্ডা হইতে টাকার তোড়ার মুখ খুলিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া দিব, আপনারা যত পারেন, কুড়াইয়া লইবেন।"

কাছারী-বাড়ীতে সে রাত্রে যত লোক ছিল, তাহারা কেহই উঠিল না, দ্বারপালেরা পর্য্যন্ত জাগিল না। বাড়ীর ভিতর মশাল জ্বলিতেছিল, লোকেরা চীৎকার করিতেছিল, সদর-দরজা খুলিয়া ফেলিয়াছিল, তত শব্দেও কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সত্য-নিদ্রা হইলে অবশ্যই ভঙ্গ হইত। গোপেশ্বরবাবুর বুদ্ধিকে ধন্যবাদ, সকলেরই কপট-নিদ্রা, কেহই জাগিল না।

গোপেশ্বরবাবু উপরে গিয়া উঠিলেন। নীচের লোকেরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমিতে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণমধ্যেই উপর হইতে টাকাবৃষ্টি হইতে লাগিল। বসন্তকালের শেষে আকাশ হইতে যেমন শিলাবৃষ্টি হয়, সেই রকম শুভ্রবর্ণ রজত-মুদ্রা-বৃষ্টি। গোপেশ্বরবাবু উপরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া

বড় বড় হাজারী তোড়ার মুখ খুলিয়া হুড় হুড় করিয়া টাকা ঢালিয়া দিতেছেন, নীচের লোকেরা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে কুড়াইয়া লইতেছে। টাকাগুলি এক এক জায়গায় কাঁড়ি হইয়া পড়িতেছে না, তোড়া-সঞ্চালনের সুকৌশলে অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বালকেরা যেমন হরির লুট কুড়ায়, লোকেরা সেইরূপে ইতস্ততঃ ছুটিয়া ছুটিয়া হেঁট হইয়া উভয় হস্তে মুদ্রা সংগ্রহ করিতেছে। টাকার লুট।

গোপেশ্বরবাবু ক্রমাগতই টাকা ঢালিতেছেন, দুই এক মিনিট বিলম্বও করিতেছেন, দস্যুদলের ক্রমশই আনন্দ বাড়িতেছে ; যাহারা টাকা কুড়াইতেছে, তাহারা ডাকাত, বর্ষে বর্ষে তাহারা ঐ কাছারী-বাড়ীতে ডাকাতী করে. এ বৎসর ততটা পরিশ্রম করিতে হইল না, কাছারীর লোকেরা ভয় পাইয়া আপনা হইতেই টাকা ঢালিয়া দিতেছে, ইহাই তাহারা মনে করিল।

অবিশ্রান্ত টাকাবৃষ্টি। দস্যুদল মনের সাধে লুট করিতেছে। ডাকাতের ভয় থাকে না, নির্ভয়ে বলপ্রকাশ করিয়া, মশালের আগুনে মানুষ পোড়াইয়া, কোন কোন স্থানে নিরীহ গৃহস্থগণকে তলোয়ারে কাটিয়া গৃহের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লয়, বরিশালের কাছারী-বাড়ীর ডাকাতী এ বৎসর ভিন্ন প্রকার। নরহত্যা করিতে হইল না, দরজা ভাঙ্গিতে হইল না, সিন্দুক ভাঙ্গিতে হইল না. অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, সম্পূর্ণ নির্ভয়, তাহাতেই অধিক আনন্দ।

ঝমাঝম টাকা পড়িতেছে ; হনূমানের মত হুম্‌হাম্ করিয়া ডাকাতেরা বড় একখানা সতরঞ্চির উপর সেই সকল টাকা জড়

করিতেছে, রাত্রি ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম করিয়া চারিবার বন্দুকের আওয়াজ হইল। উপর হইতেই আওয়াজ;—একমিনিট অন্তর আওয়াজ।

ডাকাতেরা চমকিয়া উঠিল। কত রাত্রি আছে, তাহা তাহারা জানিল না, টাকা-বৃষ্টি হইবারও বিরাম হইল না, ডাকাতের লোভেরও শান্তি হইল না, বন্দুকের আওয়াজের দিকে তাহারা ততটা মনও দিল না, কেন আওয়াজ হইল, তাহা জানিবার জন্যও কেহ ঊর্দ্ধদিকে চাহিল না, বাহিরের দিকেও চাহিল না, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিল না, প্রবল উৎসাহে টাকা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত।

ভোর হইল। অল্প অল্প অন্ধকার আছে, অথচ শীতল বাতাস বহিতেছে, পূর্ব্বদিক্ অল্প অল্প ফর্সা হইয়া আসিতেছে, টাকাবৃষ্টি বন্ধ হইল। ডাকাতেরা বুঝিল, জাল গুটাইবার সময় উপস্থিত। সতরঞ্চির উপর সমস্ত টাকা জমা হইয়াছিল, একটা মোট বাঁধিয়া দুই একজনে সেই মোট মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে, তেমন সম্ভাবনা ডাকাতেরা বুঝিল না। তাহাদের সঙ্গে খানকতক ছোট ছোট কম্বল ছিল, একমণী দুইমণী বস্তা ছিল, সেই সকল কম্বলে তাহারা ছোট ছোট মোট বাঁধিল, বস্তাতে বস্তাতে টাকা পূর্ণ করিল। ঊষাকাল যতক্ষণ থাকে, ডাকাতের সুবিধার জন্য তাহা অধিকক্ষণ থাকিল না, প্রভাত হইবার অতি অল্পমাত্র বিলম্ব। মোট মাথায় করিয়া ডাকাতেরা বাহির হইল; মোট বহন করা যাহাদের কার্য্য নয়, তাহারা শূন্যহস্তে বাহকগণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পোড়া মশালগুলা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া কাছারীর প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিল। দস্যুদলের হস্তে যে সকল

অস্ত্র ছিল, তাহাও একখানা কম্বলে জড়াইয়া সর্দ্দারেরা একজনের মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল। যখন তাহারা বাহির হইল, দেউড়ীর দরোয়ানেরা তখন শয্যাত্যাগ করিয়া আপনাদের খাটিয়ার উপর বসিয়া চক্ষু মুছিতেছিল, হাই তুলিতেছিল, কেহ কেহ ভজন গাহিতেছিল; ডাকাতের দল বাহির হইল, কেহই কিছু বলিল না।

অদ্ভুত কাণ্ড!—চারিদেকে ক্ষেত্রভূমি দিবা দ্বিপ্রহরের ন্যায় প্রখর উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত! চতুর্দ্দিকে অগ্নিক্ষেত্র। ক্ষেত্র পার হইয়া ডাকাতেরা যে দিকে যায়, সেই দিকেই অগ্নিক্ষেত্র, দাউ দাউ করিয়া ঘর জ্বলিতেছে, চটাপট শব্দে বাঁশ ফাটিতেছে, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা আকাশ-পথে উঠিতেছে, উত্তপ্ত ধূমরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে,পঞ্চাশ হস্ত দূরে এক পা অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য! বিভ্রান্ত ডাকাতেরা ছুটাছুটি করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিল, কোন দিক্ দিয়াই বাহির হইবার পথ পাইল না। সকল দিকেই আগুন, সকল দিকেই ধূমপুঞ্জ, সকল দিকেই ভীষণ দৃশ্য! অগ্নি যেন জ্বলন্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে গিলিতে আসিতেছে, মহাতঙ্কে তাহাই তাহারা বিবেচনা করিল। কাছারী-বাড়ীর চারিদিকেই প্রশস্ত ক্ষেত্রসীমায় অগ্নিদেবের রাজত্ব।

রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদয় হইলেন, অগ্নি-শিখা সূর্য্যকে স্পর্শ করিবার অভিলাষেই যেন আকাশপথে ধাবিত হইতে লাগিল। পবনদেব উত্তম খেলা পাইলেন। বাতাসে আলো নিবিয়া যায়, ঐ সকল আলো বাতাস পাইয়া আরও অধিকতেজে জ্বলিয়া উঠিল। দুর্ব্বলের কাছে প্রবলের জোর খাটে, প্রবলের কাছে প্রবলেরা অনুগত হয়। প্রদীপ

জ্বলিতেছে, একটু হাওয়া পাইলেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; গৃহদাহ হইতেছে, হাওয়া সেই সময় অগ্নির সহায় হয়; কোথাও হাওয়া না থাকিলেও অগ্নিকাণ্ডক্ষেত্রে প্রবল ঝটিকার ন্যায় বাতাসের জোর হইয়া থাকে; এখানেও তাহাই হইতেছে। ধূ ধূ করিয়া ঘর জ্বলিতেছে, বড় বড় হল্কা উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বহিতেছে। ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

ডাকাতেরা কোন দিকেই পথ পাইল না; আগুনের নিকটেও যাইতে পারিল না, দূরে দূরে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। বেলা বাড়িতে লাগিল। তাহাদের অন্তরাত্মা কম্পিত হইল, ভয়ে সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল।

বেলা দুই প্রহর। মাথার উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, সম্মুখে প্রদীপ্ত হুতাশন। সূর্য্যের প্রখর তাপে এবং হুতাশনের প্রচণ্ড উত্তাপে ডাকাতের দল এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িল; তাহাদের সর্ব্বশরীরে ঘাম ঝরিতে লাগিল; আগুন-ভেল্কী লাগিয়া গেল। আর তাহাদের ঘুরিয়া বেড়াইবার শক্তি রহিল না। বৃক্ষ-শূন্য উত্তপ্ত ক্ষেত্রে ক্রমাগত বহুক্ষণ ঘুরিয়া তাহারা একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নিরুপায়। কি করে, কোথায় যায়, কি দশা হয়, ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা সেই সময় তাহারা পুনরায় সেই কাছারীবাড়ীর মধ্যে আশ্রয় লইতে গেল। যাহারা সর্দ্দার, তাহারা ভাবিল, আশা ত ফুরাইয়াছে, লুটের মাল ফিরাইয়া দিতেই হইবে, তাহা দিয়াও যদি এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাও ভাগ্যবল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কাছারীতে বেশী লোক নাই, আমাদের দলে অনেক লোক, কাছারীর লোকেরা আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, আশ্রয় চাহিলে আশ্রয় পাইব,

অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে রিক্তহস্তে বাহির হইতে পারিব, তাহার পর যদি আবার শুভদিনের উদয় হয়, তখন পুনর্ব্বার ধনবৃদ্ধি করিতে পারিব। এই ভাবিয়াই দলবলের সঙ্গে তাহারা কাছারীবাড়ীতে প্রবেশ করিল।

কাছারীবাড়ীতে কি আছে? উপস্থিত হইয়া কি তাহারা দেখিল?—যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি হইল। দেখিল, দেউড়ীতে অস্ত্রধারী প্রহরী, তাহাদের নিকটে সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় পঞ্চাশজন পুলিসের লোক। আর কি দেখিল? তাহাদের দলে যাহারা প্রধান খেলোয়াড় ছিল, বাড়ীর বাহিরে যাহারা মোরিয়া হইয়া ঘাঁটী দিত, তাহারাই সেইখানে উপস্থিত। তাহারা সেই গতদিবসের কুড়িজন মল্ল।

ডাকাতেরা পুনঃ-প্রবেশ করিবামাত্র পুলিসের লোকেরা সর্ব্বাগ্রে সেই পূর্ব্বকথিত বাহকের মস্তক হইতে দস্যুদলের অস্ত্র-শস্ত্রের বোঝাটা কাড়িয়া লইল। সেই দিকে চাহিয়া দস্যুগণ যেন কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুলিসের লোক কখন্ আসিয়াছিল?—গতদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে মল্লক্রীড়া আরম্ভ হইবার অগ্রে তাহাদের প্রবেশ। সরস্বতী-পূজার নিমন্ত্রণ ছিল, তাহার পূর্ব্বেও নিমন্ত্রণ ছিল, পাঁচথানার পাঁচ জন দারোগা পঞ্চাশজন বরকন্দাজের সহিত গুপ্তভাবে আসিয়া কাছারীর এক গুপ্তগৃহে লুকাইয়া ছিলেন। গোপেশ্বর-বাবু তাঁহাদিগকে নিজের মন্ত্রণার কথা জানান নাই, কিন্তু রজনী-প্রভাতে যাহা করিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ডাকাতের দলে কত লোক, দারোগারা তাহা জানিতেন না, হাতকড়ী আনেন নাই, মোটা মোটা শণের দড়ী আনিয়াছিলেন।

ডাকাতের দলে যাঁহারা বাবু, তাঁহাদের সকলেরই কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরা ছিল, বাকী লোকের গা আদুড়। বাবুলোকগুলির পোষাক খুলিয়া শণের দড়ী দিয়া তাঁহাদিগকে পিছমোড়া করিয়া বন্ধন করা হইল। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শরীর, শণের দড়ীর বন্ধনে তাঁহাদের সুন্দর সুন্দর বাহুতে যেন রক্ত ঝুঁঝিয়া আসিতে লাগিল। রবিতাপে, অগ্নিতাপে সুন্দর মুখগুলি রক্তবর্ণ হইয়াছিল, সেই সকল মুখে একটীও বাক্য নির্গত হইল না। বাবুরা ষোলজন। তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজনের গলায় গোচ্ছা গোচ্ছা যজ্ঞসূত্র; সেই চিহ্ন ধরিয়া বলিতে হইল, পাঁচজন ব্রাহ্মণ। বাকী এগারজন বাবু বটে, কিন্তু কে কি জাতি, তাহা জানা গেল না।

বাবু ষোল জন, অবাবু ৬৪ জন, সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ জন। মল্লযুদ্ধের জন্য পূর্ব্বদিন যাহাদিগকে আনিয়া চাবীবন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহারা খোলসা থাকিলে দল পূর্ণ হইত—একশ জন। ষোলজন বাবুকে বন্ধন করিবার পর বাকী ৬৪ জনকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইল। কুড়িজন মল্লকে বন্ধন করা হইল না।

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যাহারা ঘুরিয়াছিল, কাছারীবাড়ীতে একটু ছায়া পাইবে, ইহাই তাহারা মনে করিয়াছিল, কিন্তু পুলিসের দারোগারা ততটা দয়া রাখেন না, তাঁহারা ঐ ৮০ জন ডাকাতকে কাছারীবাড়ীর উঠানে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিলেন। দেউড়ীর সদর-দরজায় বড় বড় ডবল-তালা বন্ধ করা হইল।

ডাকাত যখন বাঁধা হয়, গোপেশ্বরবাবু কিম্বা জমিদার বাবুরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, পুলিসের কার্য্য পুলিস করিতেছে, বাবুদিগের সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজনও ছিল না। বন্ধনগ্রস্ত হইয়া একজন বাবু ডাকাত কাঁদিতে কাঁদিতে

একজন দারোগাকে বলিল, "আমরা কুকার্য্য করিয়াছি, ক্ষমা চাহিতেছি, আমাদের বন্ধন খুলিয়া দাও। গতরাত্রে যত টাকা আমরা এই স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে, ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি, আমাদিগকে চালান করিও না; দয়া কর, – দয়া কর!"

হাস্য করিয়া দারোগা বলিলেন, "চোরবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা!"—এই শ্লোক পাঠ করিয়া দারোগা বলিতে লাগিলেন, "তোমরা এখন ধরা পড়িয়াছ, তোমাদের বিদ্যা বাহির হইয়া গিয়াছে, বিচিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তোমাদের পরীক্ষা হইবে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আর তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না। দেখিতেছি, তুমি একজন দাতালোক। এই কাছারার যত টাকা লুট করিয়াছ, সমস্তই দান করিতে চাহিতেছ। যাঁহারা দান গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা রাজী না হইলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিব না;—পারিব, কিন্তু এখানে রাখিয়া যাইতে পারিব না; যেখানে তোমাদের পরীক্ষা হইবে, সেইখানে লইয়া গিয়া জমা দিতে আমি বাধ্য। তুমি আমার কাছে দয়া ভিক্ষা করিতেছ। তোমাদের মত লোককে যদি দয়া করা যায়, তাহা হইলে যথার্থ দয়ার পাত্রেরা বঞ্চিত হইবে। আমি এখন—"

দারোগা আরও কথা বলিতেছিলেন, বলা হইল না, গোপেশ্বর-বাবু উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। বন্ধনদশাপ্রাপ্ত বাবু-গুলির চেহারা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দিব্য সুন্দর সুন্দর চেহারা; আকৃতি দেখিয়া যদি প্রকৃতি-নির্ণয়ের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, সে বিদ্যা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এই সকল

লোককে ডাকাত বলিয়া বিশ্বাস করা বড় সহজ কথা হয় না। কিন্তু ইহারা যখন হাতে-নোতে ধরা পড়িয়াছে, তখন প্রাচীন পণ্ডিতগণের সেই বিদ্যাকে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দেহ উপস্থিত হয়, মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া অপর ৬৪ জনের মুখের প্রতি তিনি কয়েকবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন। দুখানা মুখ তিনি চিনিলেন। কেমন করিয়া চিনিলেন, সে কথা উপযুক্ত সময়ে ব্যক্ত হইবে। যে দারোগার সহিত বাবু-ডাকাতের কথা হইতেছিল, সেই দারোগার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "উপরে দাঁড়াইয়া আমি শুনিয়াছি, একটী বাবু আপনার কাছে দয়া চাহিতেছিলেন, লুটের টাকা ফিরাইয়া দিতে অঙ্গীকার করিতেছিলেন, শুনিয়া আমার হাস্য আসিয়াছিল। এই বাবুরা—বোধ হয়, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও এই প্রকার দস্যুতা-বিদ্যায় বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন; এই কাছারী হইতেই বৎসর বৎসর প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন। এ বিষয়ের যদি তমাদী না থাকে, তাহা হইলে, আগা গোড়া হিসাব করিয়া কত টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, এই বাবু হয় ত সেটী ভাবিতে পারেন নাই। এক রাত্রের লুটের টাকা ফিরাইয়া দিলে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না, বাবুটীকে ইহা বুঝাইয়া দিলে—"

কথার ভাব বুঝিতে পারিয়াই সেই বাবু তৎক্ষণাৎ বলিল, "আপনারা যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিন বৎসরের লুটের টাকা আমরা প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

গম্ভীর-বদনে গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "এই বাবুটী ইংরাজী আইন জানেন বোধ হয়। আমি যেখানে 'যদি' রাখিয়াছিলাম, ইনি সেখানে 'যদি' রাখিলেন না, ইনি বুঝিয়াছেন, তমাদী

হইয়া গিয়াছে, তিন বৎসরের টাকা প্রত্যর্পণ করিলেই আইন-সিদ্ধ কার্য্য হয়।”

দারোগার ইঙ্গিতে জনকতক বরকন্দাজ তৎক্ষণাৎ দস্যুদলের টাকার মোটগুলা—বস্তাগুলা দপ্তরখানার ভিতর উঠাইয়া রাখিল। ডাকাতেরা সজলনয়নে সেইদিকে চাহিয়া বড় বড় নিশ্বাস ফেলিল।

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া, দারোগার দিকে চাহিয়া গোপেশ্বর-বাবু বলিলেন, “অনেক চেষ্টা করিয়াও আপনারা—আপনাদের পূর্ব্বপদস্থ দারোগারাও কাছারার ডাকাতার কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। এই বৎসর ধর্ম্মের কলে ইহারা ধরা পড়িয়াছে। এই দলের একজন ভদ্রলোক—বংশগৌরবে ভদ্র বলিতে হয়,—একজন ভদ্রসন্তান আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা করিতেছেন, আমার খাতিরে দুই ঘণ্টার জন্য আপনি ইহাদের প্রতি দয়া করুন, বন্ধন খুলিয়া দিন;—বেচারারা বিস্তর কষ্ট পাইয়াছে, সারারাত্রি জাগিয়াছে, ঢোলক-মন্দিরা বাজাইয়া, গোপীযন্ত্র বাজাইয়া, খোল-করতাল বাজাইয়া কত রাত্রি পর্য্যন্ত গান করিয়াছে, তাহার পর হরির লুট কুড়াইয়াছে, তাহার পর বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সূর্য্যের তাপে, অগ্নির তাপে মাঠে মাঠে ঘুরিয়াছে, এখন বেলা আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে স্নানাহার করাইতে হইবে। সরস্বতী-প্রতিমা এই বাড়ীতে এখনও পদ্মাসনে দাঁড়াইয়া আছেন। সাধু অসাধু কোন ব্যক্তিকে এ বাড়ীতে অভুক্ত রাখিলে সরস্বতীর, লক্ষ্মীর, অন্নপূর্ণার কোপ হইবে। দুই ঘণ্টার জন্য আপনি এই বন্দিগণের বন্ধন-মোচন করিবার হুকুম দিন।”

এক প্রকারে গোপেশ্বরবাবুর হুকুম। সেই হুকুমের প্রতি-ধ্বনি করিয়া দারোগা সেইরূপ হুকুম দিলেন, বরকন্দাজেরা হুকুম তামিল করিল। অনন্তর বাড়ীর মধ্যেই স্নান করাইয়া দস্যুগণকে বিবিধ ভোজ্য-সামগ্রী ভোজন করান হইল। দস্যুদলের পুনঃ-প্রবেশের অগ্রে কাছারীর সকল লোকের আহারাদি হইয়াছিল, মল্লেরাও আহার করিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দস্যুগণের পুনরায় বন্ধন। রাত্রিকালে তাহাদিগকে কাছারীতে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবরুদ্ধ রাখা হইল। একটী স্বতন্ত্র গৃহে বাবু-ডাকাতেরা ষোলজন।

রাত্রি যখন এক প্রহর, সেই সময় গোপেশ্বরবাবু বন্দিগণের গৃহে গৃহে এক একবার গমন করিলেন। যে ঘরে বাবুরা, সেই ঘরে প্রথম প্রবেশ। একজন বালক-ভৃত্য দোয়াত, কলম, কাগজ দিয়া আসিল; ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, আর একটা বাতী জ্বালিয়া দিয়া গেল। বাবুগুলিকে গোপেশ্বরবাবু যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন,তাহার ঠিক ঠিক উত্তর পাইলেন না; বুঝিলেন, পুলিসের যন্ত্র-মন্ত্র প্রযুক্ত না হইলে ঐ প্রকৃতির লোকের মনের কথা পাওয়া যায় না;—সত্যকথা বাহির হয় না;—পাওয়া যাইবে না,—বাহির হইবে না;—ইহা বুঝিয়াও যতটুকু উত্তর পাইলেন,ততটুকু লিখিয়া লইলেন। দলের অবশিষ্ট ৬৪জনকে এক ঘরে রাখা হয় নাই; ষোলজন ষোলজন করিয়া চারিঘরে রাখা হইয়াছিল; একে একে সেই চারিঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি সেই ৬৪ জনের জবানবন্দী লইলেন। তাহাদের কথাগুলিও যথা যথা লিখিয়া লওয়া হইল।

যে ঘরে কুড়িজন মল্ল, শেষকালে সেই ঘরে গোপেশ্বরবাবুর

প্রবেশ। বলা হইয়াছে, মল্লগণকে বন্ধন করা হয় নাই। গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপেশ্বরবাবু তাহাদের সম্মুখে বসিলেন, কিয়ৎক্ষণ তাহাদের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "ছয় মাসের মধ্যে তোমরা কি দিনাজপুরে গিয়াছিলে?"

চমক-বিস্ময়ে কুড়িজনেই মহা বিস্মিত। উত্তর করিবার অগ্রে বিস্মিত-নয়নে তাহারা প্রশ্নকর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া রহিল। উত্তর-বাক্য শ্রবণ না করিয়াই গোপেশ্বরবাবু বুঝিতে পারিলেন, ঠিক ধরা হইয়াছে, ইহাদের মুখ হইতে কতক কতক সত্যকথা বাহির করিতে পারিলে মূল তদন্তের সূত্র ধারণ করা যাইতে পারিবে।

পুনরায় সেই প্রশ্ন।—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অভয়দান করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "বুঝিয়াছি তোমাদের মনের ভাব, তোমাদের কোন ভয় নাই, নির্ভয়ে সত্যকথা বল; সত্য গোপন করিলে কোন মতেই তোমরা রক্ষা পাইবে না। আমি কেহই নহি, আমাকে তোমরা পুলিসের লোক মনে করিয়া ভয় পাইও না, পুলিসের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমার সাক্ষাতে যদি তোমরা সত্যকথা বল, আমি তোমাদের রক্ষার উপায় করিতে পারি; আমার কাছে মিথ্যাকথা বলিলে পুলিস তোমা-দিগকে ছাড়িবে না। পুলিস এখানে উপস্থিত আছে, তোমাদের কথায় যদি আমি কিছু গোলযোগ বুঝিতে পারি, এখনই পুলি-সকে জানাইব। এখনি তোমরা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইবে, সাবধান হইয়া কথা কও, রক্ষা চাও কি বন্ধন চাও, ভালরূপে বিবেচনা করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তোমরা দিনাজপুরে গিয়াছিলে কি না?"

এত কথা শুনিয়াও সেই কুড়িজন পূর্ব্ববৎ নীরব হইয়া রহিল, একটী কথাও বলিল না।

গোপেশ্বরবাবু নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন।—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,"আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার সময় তোমরা কোথায় ছিলে?"

এইবার সেই সকল লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাহারা তখন বুঝিতে পারিল, ইনি সমস্ত গুপ্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন; চাতুরী করিয়া ইহাঁকে ভুলাইতে পারা যাইবে না। পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিয়া সম্মুখের একজন কম্পিতস্বরে বলিল, "আশ্বিন—আশ্বিন—আশ্বিনমাসে আমরা—"

ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই লোকটী থামিয়া গেল। গোপেশ্বরবাবু তাহার মুখের কথা সমাপ্ত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "দিনাজপুরে।"

যে লোক কথা কহিতেছিল, পূর্ব্ববৎ কম্পিতকণ্ঠে সে তখন প্রতিধ্বনি করিল, "আজ্ঞে হাঁ, দিনাজপুরে।"

এই লোকটার নাম, গদাই লস্কর।

গোপেশ্বরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানকার পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর দিয়া পাতালপথে একটা পাথরের কেল্লায় প্রবেশ করা যায়, সে পথ তোমরা জানো?"

গদাই। আজ্ঞে, জানি।

গোপে। সেই কেল্লার মধ্যেই তোমরা ছিলে?

গদাই। আজ্ঞে, ছিলাম।

গোপে। কত দিন?

গদাই। একমাস দশ দিন।

গোপে। সেখানে থাকিয়া তোমরা কি কার্য্য করিতে?

গদাই। আজ্ঞে, ও কথা আপনি কেন জিজ্ঞাসা করেন?

গোপে। জিজ্ঞাসা করিবার কারণ না থাকিলে তোমাকে আমি বৃথা কষ্ট দিতাম না। কারণ আছে, সেই জন্যই তাহা আমি জানিতে চাই। কি কার্য্য করিবার জন্য পাতালের কেল্লায় তোমরা আশ্রয় লইয়াছিলে?

গদাই। আজ্ঞে, মানুষের কার্য্য অনেক প্রকার। পাঁচ রকম কার্য্যেই—

গোপে। পাঁচ রকমের এক রকম কি শিবপূজা?

গদাই। (মাথা হেঁট করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া) আজ্ঞে, সে শিবের পূজা হয় না।

গোপে। একদিন উষাকালে তোমরা অনেক লোক একত্র হইয়া অরণ্যের একটা বৃক্ষতলে বসিয়াছিলে, বাবুদের গল্প করিয়াছিলে, তোমাদের সঙ্গে গোটাকতক মোট ছিল। সে সকল কিসের মোট, আমার সাক্ষাতে তাহা তুমি বলিতে পার? কোন ভয় নাই; তুমি সত্যকথাই বলিতেছ, আমি খুসী হইতেছি, সমস্তই সত্য বল। কিসের মোট?

গদাই। আজ্ঞে, আমরা আদেশ পালন করিয়াছিলাম।

গোপে। সেখানে তোমাদের আদেশকর্ত্তা কে ছিল?

গদাই। সেখানে—সেখানে—আদেশ—

গোপে। বাবুরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

গদাই। আজ্ঞে, সকলে সকলে—না, দুজন—

গোপে। দুজন বাবুর আদেশে সেখানে তোমরা ডাকাতী করিতেছিলে?

গদাই। (নিরুত্তর)

গোপে। আচ্ছা, সেই দুজন বাবুর মধ্যে একজন বাবুর নাম ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজ?

গদাই। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, মাথা তুলিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া) আজ্ঞে,—ধর্ম্ম - ধর্ম্ম—ধর্ম্ম -

গোপে। আচ্ছা, তোমাদের সেই কেল্লার ভিতর বৃহৎ একটী কৃষ্ণবর্ণ কুকুর ছিল, সে কুকুর কাহার? তোমাদের বাবুদের?

গদাই। আজ্ঞে না, সে কুকুর আগে ছিল না, একদিন হঠাৎ আমাদের দলের লোকের সঙ্গে সুড়ঙ্গ গহ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল, বাবুর আদেশে লোহার শিকল দিয়া আমরা সেই কুকুরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম।

গোপে। আচ্ছা, আর কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়াছিলে?

গদাই। আজ্ঞে না।

গোপে। লোহার শিকল দিয়া বাঁধা নয়, অন্য কোন প্রকারে আটক রাখিয়াছিলে?

গদাই। (নিরুত্তর)

গোপে। আচ্ছা, দুটী সুন্দরী কন্যা সেই কেল্লার ভিতর ছিল; ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজ তাহাদের কাকা, কন্যা দুটীকে এই কথা বুঝাইয়া রাখা হইয়াছিল, সত্য কি তোমাদের ধর্ম্মানন্দবাবু সেই কন্যা দুটীর কাকা?

গদাই। আজ্ঞে, শুনিতাম ঐ রকম, কিন্তু সত্য মিথ্যা জানি না।

গোপে। তোমরা যখন দিনাজপুরের আড্ডা উঠাইয়া এ অঞ্চলে চলিয়া আইস, তখন সেই কুকুরটীকে আর সেই মেয়ে দুটীকে সঙ্গে আনিয়াছিলে?

গদাই। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে—একরাত্রে আমরা বাহির

হইয়াছিলাম, ফিরিয়া গিয়া সে মেয়ে দুটীকে দেখিতে পাই নাই, কুকুরটীকেও পাই নাই। মেয়ে দুটী মন্দিরে উঠিবার পথ জানিত, কুকুর লইয়া তাহারা কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত সন্ধান হয় নাই।

গোপে। একরাত্রে?—কোন্ রাত্রে?—দুর্গাপূজার অগ্রে মহালয়া অমাবস্থার রাত্রে? সে রাত্রে তোমরা কোথায় বাহির হইয়াছিলে? কোথায় কাহার বাড়ীতে ডাকাতী করিয়াছিলে?

গদাই। আজ্ঞে, সে অঞ্চলে আমরা আর কখনও যাই নাই; গ্রামের নাম কিম্বা বাড়ীওয়ালার নাম আমি বলিতে পারিব না।

গোপে। উত্তম,—উত্তম!—তুমি বেশ সত্যকথা বলিতেছ, সকল কথাতেই আমি খুসী হইতেছি। আজ রাত্রে আর একটী-মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই আমি প্রশ্ন সমাপ্ত করিব। আচ্ছা, আজ দিনমানে যে ষোলজন বাবুকে এখানে বন্ধন করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ; সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে তোমাদের সেই ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজকে তোমরা চিনিতে পারিয়াছ কি না?

গদাই। আজ্ঞে, ধর্ম্মা—ধর্ম্মা—ধর্ম্মানন্দ আছেন।

গোপেশ্বরবাবু এইখানে প্রশ্ন বন্ধ করিয়া কাগজগুলি লইয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। গদাই লস্করের সহিত তাঁহার যতগুলি কথা হইয়াছিল, লিখিয়া লইবার সময় তাহার একটী কথাও তিনি বাদ দেন নাই। তিনি বাহির হইলেন, বন্দিগণের ঘরে ঘরে চাবী পড়িল; দ্বারে দ্বারে পাহারা বসিল।

পাঁচজন দারোগা আসিয়াছিলেন। গোপেশ্বরবাবু উপরে উঠিয়া গিয়া দারোগাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যে থানার

এলাকায় সেই কাছারী, সেই থানার দারোগাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিন আপনি বন্দিগণকে এখানে রাখিতে পারেন ?"

দারোগা উত্তর করিলেন,"স্থানীয় তদন্ত যত দিন শেষ না হয়, তত দিন আমি উহাদিগকে এখানে ঐ ভাবে আটক রাখিতে পারিব। তদন্ত শেষ না হইলে চালান করিয়া দিবার জন্য পুলিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা বাধ্য নহেন, আইনের এইরূপ মর্ম্ম।"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "আইনের মর্ম্মের কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না, ডাকাতেরা ধরা পড়িয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ণে এ কথা প্রবেশ করে নাই, আপনারাও ডাকাত ধরেন নাই, ধর্ম্মের কলে উহারা ধরা পড়িয়াছে। স্থানীয় তদন্তের কথা কেন বলিতেছেন, আমি উহাদিগের নিজ নিজ মুখেই সকল কথা কবুল করাইব। দৈবাৎ একবার এইখানে ডাকাতী হইয়াছে, ইহা নহে, আপনারা জানেন, বর্ষে বর্ষে ধারাবাহিকরূপে এই কাছারীতে ডাকাতী হয়। মাঘমাসেই ডাকাতী হয়, একবৎসরেও আপনারা কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। কেবল আপনারা কেন, আপনাদের পূর্ব্বপদস্থ বড় বড় নামজাদা দারোগারাও একজনকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই। থানাওয়ালাদের প্রাণের ভয় আছে, আপনাদের দোষ নাই। যখন যেখানে ডাকাতী হয়, থানায় সংবাদ পৌছিলেও থানার লোকেরা সে রাত্রে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হন না, উপস্থিত হইতে সাহস করেন না। প্রাণের ভয় ভিন্ন ইহার আর অন্য কারণ নাই। ডাকাতেরা নির্ভয়ে ইচ্ছামত ডাকাতী করিয়া

নিরাপদে প্রস্থান করিলে পর পুলিসের তদারক আরম্ভ হয়, সে তদারকে কেবল আসর সরগরম ভিন্ন অন্য ফল হয় না, ইহা আপনারা জানেন। সন্দেহক্রমে দুই এক জনকে ধরিয়া কোন কোন স্থলে পীড়ন করা হইয়া থাকে, তাহাতেও তাদৃশ ফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এখানকার ঘটনা ভিন্ন প্রকার। এখানে কাহাকেও সন্দেহ করিয়া ধরা হয় নাই। ঘটনা-ক্ষেত্রে বামাল গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, স্থানীয় তদন্তের জন্য আপনারা একমাস সময় লইতে পারেন, বেশী সময়ও লইতে পারেন, কিন্তু আমি বলিতেছি, একমাসের অধিক সময় প্রয়োজন হইবে না। আমার কতকগুলি কার্য্য আছে, সেইগুলি শেষ হইলেই আপনাদের হস্তে অপরাধীগণকে আমি সমর্পণ করিব। আজ রাত্রে আপনারা এই কাছারীবাটীতে থাকুন, কল্য প্রাতঃকালে বিদায় হইবেন। নিত্য এক একবার আসিতে চাহেন আসিবেন, না আসিলেও কোন ক্ষতি হইবে না, যাহারা ধরা পড়িয়াছে, তাহারা এখান হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না। দলের ভিতর কতকগুলি বাবু আছে, আমি সেই বাবুদের পরিচয় লইব, এই আমার প্রথম কার্য্য; সে কার্য্যের সময় পুলিসের লোক উপস্থিত থাকিবার আবশ্যক হইবে না। তবে যদি আপনি আপনার কর্ত্তব্যের অনুরোধে এখানে পুলিস মোতায়েন রাখিতে ইচ্ছা করেন, দুই জনকে রাখিয়া যাইতে পারেন, দেউড়ীর দ্বারবান্‌দের সঙ্গে তাহারা থাকিবে, জমিদার-সরকার হইতেই খোরাকী পাইবে।"

দারোগা সম্মত হইলেন। জমিদার বাবুরা ভিন্ন ঘরে ছিলেন, দারোগার সহিত গোপেশ্বরবাবুর কি কি কথা হইল,

তাহা তাঁহারা শুনিলেন না; গোপেশ্বরবাবুর মুখে শেষকালে শুনিবেন কি না, তাহা গোপেশ্বরবাবুর মনেই রহিল।

সে রাত্রে আর অন্যকার্য্য কিছুই হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে পুলিসের লোকেরা যখন বিদায় হন, বাবুদের সহিত তখন তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। এলাকার দারোগা আপনার ক্ষমতা জানাইয়া বলিলেন,"ডাকাতেরা আপনাদের যত টাকা লুট করিয়াছিল, দায়ে পড়িয়া তাহা সমস্তই ফিরাইয়া দিয়াছে, সে সকল টাকা কিন্তু আপনারা এখন ঘরে রাখিতে পারিবেন না। ডাকাতেরা চালান হইলে হাকিম যখন মালের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন ঐ সকল টাকা হুজুরে দাখিল করিতে হইবে; অতএব ঐ সমস্ত টাকা এখন আমরা থানায় লইয়া যাইতে চাই। দায়রা-আদালতে আসামীরা সাজা পাইয়া গেলে আপনারা রসাদ দিয়া সমস্ত টাকা তুলিয়া আনিবেন।"

গোপেশ্বরবাবু আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, "দশ বিশ টাকা অথবা খানকতক তৈজসপত্র, দুই একটা সিন্দুক, দুই পাঁচখানা বস্ত্র, এইরূপ সামান্য সামান্য অপহৃত দ্রব্য হইলে আপনারা তাহা থানায় লইয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার টাকা অপেক্ষাও অধিক। এত টাকা থানায় লইয়া গিয়া ফেলিয়া রাখিবেন? বরিশাল জায়গা বিস্তর বদ্‌মাস লোকের আড্ডা, টাকার লোভে থানাতে ডাকাতী হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ চোরা মাল লইয়া চোর পলাইতেছে, পুলিসের লোক যদি সেই সময় চোরকে ধরে, তাহা হইলে চোরের মাথায় চোরা মাল দিয়া থানায় লইয়া যাইতে পারে। এখানে তাহা হয় নাই; পুলিস কিছুই করে নাই। ডাকাতেরা আপনারাই

কাছারী-বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে। টাকাগুলি কাছারীতেই থাকুক্, কত টাকা, তাহা বরং আপনারা গণনা করিয়া একথানা ফর্দ্দ লইয়া যাউন। আদালতে দাখিল করিবার প্রয়োজন হইলে এইখান হইতে দাখিল করা হইবে।"

দারোগা খানিকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করিলেন, কিন্তু তাহা বিফল হইল। গোপেশ্বরবাবুর কথা বলবৎ রহিল; জমিদার-বাবুরাও গোপেশ্বরবাবুর কথার পোষকতা করিলেন। তাহার পর টাকা গণনা। অত টাকা গণনা করিতে বহুক্ষণ লাগিবে, ওজন করিয়া সংখ্যা নিরূপণ করা হইল; বড় বড় নিক্তির ওজনে স্থির হইল, পঞ্চাশ হাজার সাত শত তিপ্পান্ন টাকা। একথানা খাতা-বহিতে ঐ সকল টাকার পরিমাণ লিখিয়া লইয়া দারোগারা বিদায়গ্রহণ করিলেন; বরকন্দাজেরাও তাঁহাদের সঙ্গে গেল। কেবল দুই-জন মাত্র কাছারীবাটীতে যোতায়েন থাকিল।

অষ্টম কাণ্ড।

ডাকাতী করিয়া ডাকাতেরা পলায়ন করিতে পারে নাই। চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইবার কারণ কি, অনেকেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। অতএব সেই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ এইখানে সংক্ষেপে বলিয়া দিতে হইল।

বলা হইয়াছে, ঐ জমিদারী কাছারীবাটীখানি যেন একটী দ্বীপ। চতুর্দ্দিক্স্থ বহুদূরব্যাপী ধান্যক্ষেত্র যেন বিশাল সমুদ্র।

কৃষকবর্গের ঘরগুলি যেন সমুদ্রের বেলাভূমির স্বরূপ হইয়া ক্ষেত্র-প্রান্তে ঠাঁই ঠাঁই নির্ম্মিত হইয়াছিল। পৌষমাসের শেষে গোপেশ্বরবাবু কাছারীবাটীতে উপস্থিত হইয়া নূতন নূতন ঘর বাঁধাইবার ব্যবস্থা করেন। ফাঁক ফাঁক ঘর ছিল, মধ্যে মধ্যে অনেক জায়গা খালি ছিল, সেই সকল ব্যবধানস্থানে নূতন নূতন ঘর বাঁধা হয়; গায়ে গায়ে ঘর, চালে চালে ঘর; চারি-দিকের কোন দিকেই একটু ফাঁক রাখা হয় নাই। প্রজা-লোকেরা আপনাদের জিনিসপত্র লইয়া জমিদারের আদেশে কুটম্ববাটীতে চলিয়া গিয়াছিল, পুরাতন ঘরগুলি খালি পড়িয়া ছিল। এখানে সে কথা বলা পুনরুক্তি মাত্র। যে সকল নূতন ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাতে লোকজন ছিল না, এ কথা বলা বাহুল্য। চারিদিকের সমস্ত খালিঘরের চালের ভিতরে ভিতরে ধূনা, আড়া, কোড়া, বেড়া, খুঁটা সমস্ত উপকরণেই আল-কাতরা মাখানো; একমাসের অধিক কাল শুকাইয়া সেই সকল আলকাতরা ঝন্‌ঝনে হইয়াছিল। সরস্বতী-পূজার দিন যে সকল প্রজা কাছারীতে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত গোপে-শ্বরবাবুর এই পরামর্শ হয় যে, আজ রাত্রে কাছারীতে ডাকাত পড়িবার সম্ভাবনা আছে; তোমরা এক এক জন এক একটা খালি ঘরে শেষরাত্রি পর্য্যন্ত লুকাইয়া থাকিও। ডাকাত পড়িবার পর উপযুক্ত সময়ে কাছারীর বারাণ্ডা হইতে চারিবার বন্দুকের আওয়াজ হইবে। সেই সঙ্কেত বুঝিয়া তোমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘরের পশ্চাদ্দিক্ হইতে শীঘ্র শীঘ্র সকল ঘরের চালে আগুন লাগাইয়া দিয়া দূরে দূরে চলিয়া যাইও। উপযুক্ত সময়ে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া প্রজা-লোকেরা সেই পরামর্শমতেই

কার্য্য করিয়াছিল। ধূনা-পূর্ণ খড়ের চাল, আলকাতরা-মাখা সরঞ্জাম সমস্তই আশু জ্বলনশীল আগুন লাগাইয়া দিবামাত্র ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আকাশপথে প্রজ্বলিত শিখা উঠিয়াছিল, এককালে চতুর্দ্দিকে অগ্নিক্ষেত্র। কোন দিকে কাহারও পলায়নের পথ ছিল না। উষাকালে ডাকাতেরা বাহির হইয়া অগ্নিকুহকে আটক পড়িয়াছিল। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে, পাঠকমহাশয়েরা যথাস্থানেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। গোলকধাঁধা অপেক্ষাও অগ্নি-ধাঁধা ভয়ঙ্কর। সেই ধাঁধাতেই অনায়াসে ডাকাত গ্রেপ্তার।

ডাকাত ধরা পড়িল। পুলিসের তদন্ত হইল। পুলিস বিদায় হইল। ডাকাতেরা কাছারীবাটীতে আটক রহিল। সাত দিন এই ভাব। অষ্টম দিবসে গোপেশ্বরবাবু জমিদার-বাবু দুটীকে গোপনে বলিলেন, "তিন দিনের জন্য আমি স্থানান্তরে যাইব, নূতন মূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসিব। কাছারীবাড়ীর মধ্যে এমন কোন স্থান আছে কি না, যেখানে স্ত্রীলোক আসিয়া থাকিতে পারে, স্ত্রীলোকের সহিত পাঁচ জন ডাকাতের দেখা হইতে পারে, কথা হইতে পারে?"

মহানন্দবাবু কহিলেন, "দপ্তরখানার পশ্চাতে ছোট একটা মহল আছে, সেই স্থানে রন্ধনাদি হয়। পুরুষগণকে সরাইয়া দিলে সেখানে ভদ্রকুলের কুলবালারা পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন।"

মনে মনে আনন্দিত হইয়া গোপেশ্বরবাবু আহারাদির পর একাকী কাছারী হইতে বাহির হইলেন; সাত দিন অতীত হইয়া গিয়াছিল, গৃহদাহের অগ্নি নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল,

কেবল ভস্মস্তূপ,—কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার রাশীকৃত। সেই ভস্মস্তূপ অতিক্রম করিয়া গোপেশ্বরবাবু গ্রামান্তরে প্রবেশ করিলেন। সে গ্রাম হইতে আবার কোন্ দিকে কোথায় গেলেন, কেহই তাঁহাকে দেখিল না। তিন দিন পরে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা, তিন দিন অতীত হইয়া গেল। চতুর্থদিবসের অপরাহ্ণ-সময়ে কাছারীবাটীর সম্মুখে দুইখানি পাল্কী আসিয়া নামিল। একখানি পাল্কীতে একটী অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া রমণী, একটী শিশু আর একটী বৃহৎ কুকুর; দ্বিতীয় পাল্কীতে দুটী বালিকা,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা নহে, তাহাদের শরীরে যৌবনের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল।

পাল্কী নামিবার পর সেই প্রৌঢ়া রমণী পাল্কীর দ্বার খুলিয়া চারিদিকে চাহিলেন। কোথা হইতে পাল্কী আসিয়াছে, তত্ত্ব জানিবার জন্য কাছারীর লোকেরা সদর-দরজার চৌকাঠের নিকটে সারি গাথিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পাল্কীর ভিতর হইতে একটী স্ত্রীলোক মুখ বাহির করিতেছে দেখিয়া একজন বৃদ্ধ ভৃত্য সেই পাল্কীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। হস্তসঙ্কেতে রমণী তাহাকে নিকটে বসিতে বলিলেন, ভৃত্য বসিল। রমণী তাহার কাণে কাণে কি কথা কহিলেন, তাহা শুনিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া কাছারীর ভিতর চলিয়া গেল। একটু পরে মহানন্দবাবু সেই পাল্কীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমণীর ইঙ্গিতে তিনি পাল্কীর দরজার ধারে বসিলেন; রমণী তাঁহার কাণে কাণে কি কথা কহিলেন। বাবু গম্ভীরবদনে কাছারীর দরজার নিকটে গিয়া সেখানকার সমস্ত লোককে তফাতে যাইতে বলিলেন, কাছারীর প্রাঙ্গণ জনশূন্য হইল। বাবু আবার পাল্কীর কাছে

আসিলেন, রমণী ধীরে ধীরে বাহির হইলেন, সঙ্গে সেই শিশু আর কুকুরটী। দ্বিতীয় পাল্কী হইতে বালিকা দুটী বাহির হইল; তাহাদের মুখ দুখানিও ঘোমটায় ঢাকা। বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহারা কাছারী-বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে ক্ষুদ্র মহলের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাবুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সেই মহলে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

বেলা অতি অল্পই ছিল, শীঘ্রই ফুরাইল, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গেলেন, সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার পর বড়বাবু সেই মহলে দর্শন দিলেন।

প্রৌঢ়া রমণীর নাম সুরধুনী দেবী। বড়বাবু তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন। বালিকা দুটী আর সেই শিশুটী তখন নিকটে ছিল না, তথাপি সুরধুনী দেবী চুপি চুপি বড়বাবুর কাণে কাণে কতকগুলি কথা বলিলেন। বড়বাবু বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহাতে সম্মতি জানাইয়া অপরাপর প্রসঙ্গে গল্প আরম্ভ করিলেন। সুরধুনী দেবী হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনাদের জমিদারীতে এত ডাকাত ছিল, আপনারা এতদিন একটাকেও ধরিতে পারেন নাই; ইংরাজের পুলিস চোর-ডাকাত ধরিবার জন্য বেতন পায়, কিন্তু চোর-ডাকাতেরা অনেক সময়ে তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করে; কখন কখন পুলিসকে ভয় দেখাইয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যায়। এইবার ধর্ম্মের চক্রে বড় একদল ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে ষোল জন বাবু আছে। বাবু-চোরের গল্প পূর্ব্বে আমি অনেক জায়গায় শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বাবু-ডাকাত এইখানে আসিয়া নূতন শুনিলাম।"

বড়বাবুও হাস্য করিলেন। বালিকারা নিকটে না থাকিলেও গুপ্তস্থান হইতে তাহারা তাঁহাদের কথা শুনিতে পারে, সুরধুনী-দেবী সেইজন্য সাবধান; আসল কথা সে সময় তিনি একটীও ভাঙ্গিলেন না; তাঁহার অন্য পরিচয় আছে, সে কথাও সেখানে প্রকাশ হইল না।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন, সে রাত্রে অন্য কার্য্য বন্ধ রহিল। যে মহলে সুরধুনী ও বালক-বালিকারা ছিল, সেই মহলে নূতন নূতন শয্যা প্রস্তুত হইল, তাঁহারা শয়ন করিলেন, কুকুরটী দরজার ধারে জাগিয়া বসিয়া রহিল।

রজনীপ্রভাত হইলে বড়বাবুর সঙ্গে একজন লোক ঐ ক্ষুদ্র মহলে প্রবেশ করিল। সেই লোকের দুই হস্ত রজ্জুবদ্ধ, গল-দেশে যজ্ঞসূত্র, মস্তকে লম্বা লম্বা চুল। লোকটীকে সেইখানে রাখিয়া বড়বাবু বাহির হইয়া আসিলেন। রজ্জুবদ্ধ লোকটীকে দেখিয়া কুকুর বারকতক ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, সুরধুনী সঙ্কেত করিয়া তাহাকে চুপ করিতে বলিলেন, কুকুর তখন শান্ত হইল।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বালিকা দুটীকে সেইখানে আনিয়া সুরধুনীদেবী তাহাদের মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিলেন; বন্ধনগ্রস্ত লোকটীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ দেখি সরোজিনি, দেখ দেখি বিনোদিনি, তোমরা এই লোককে চিনিতে পার কি না?"

বালিকারা মাথা নাড়িল, চিনিতে পারিল না। সুরধুনী তখন সেই লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ দেখি তুমি, এই মেয়েদুটীকে চিনিতে পার কি?"

ভাল করিয়া দেখিয়া লোকটী একবার শিহরিয়া উঠিল; সত্যকথা কহিল না, মনের ভাব গোপন করিয়া অস্পষ্ট-স্বরে বলিল, "এখানকার মেয়ে, আমি কেমন করিয়া চিনিব? ইহা-দিগকে আমি কখনও কোথাও দেখি নাই।"

ঘরের দরজা বন্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু দরজার বাহিরে দুইজন দরোয়ান পাহারা ছিল। দরজা খুলিয়া সুরধুনী দেবী একজন দরোয়ানকে বলিলেন, "এই লোককে একটা অন্য ঘরে লইয়া যাও; যে ঘর হইতে আনা হইয়াছে, সে ঘরে লইয়া যাইও না, ইহাকে অন্য ঘরে রাখিয়া আর একজনকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

দরোয়ানেরা সেই লোককে অন্য ঘরে লইয়া রাখিল, যে ঘরে ষোল জন বাবু, সেই ঘর হইতেই ঐ লোককে আনা হইয়াছিল, বাকী ছিল ১৫ জন, দরোয়ানেরা সেই ১৫ জনের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণকে ক্ষুদ্র মহলে লইয়া আসিল।

প্রথম ব্যক্তিকে সুরধুনী দেবী যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এ ব্যক্তিকেও সেইরূপ প্রশ্ন করিলেন। প্রথম ব্যক্তি যেরূপ উত্তর দিয়াছিল, এ ব্যক্তিও সেইরূপ উত্তর দিল। বালিকা দুটীও সুরধুনীর প্রশ্নে পূর্ব্বরূপ মাথা নাড়িল, লোকটীকে চিনিতে পারিল না।

পর্য্যায়ক্রমে আরও দুইজনকে সেইখানে আনয়ন করা হইল, প্রশ্নোত্তর সমভাব। চারিজনেই কিন্তু মেয়ে দুটীকে দেখিয়া শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

এইবার পঞ্চম ব্যক্তি। কুকুর তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ধমক দিয়া সুরধুনী

তাহাকে চুপ করাইলেন। বালিকারা সেই লোককে দেখিয়া অবাক্ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, লক্ষণ দেখিয়া সুরধুনী বুঝিলেন, এই লোক। এই লোকটাই বালিকাদের কাকা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। বালিকাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া লোকটাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মেয়ে দুটীকে কি তুমি চিনো?"

লোক এতক্ষণ মেয়েদের মুখপানে চাহিয়া অল্প অল্প কাঁপিতেছিল, প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সেদিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিল।

সুরধুনী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নাম কি ধর্ম্মানন্দ?"

লোক যেন থতমত খাইয়া আবার সম্মুখদিকে মুখ ফিরাইল; একবার মেয়ে দুটীর মুখের দিকে, একবার সেই কুকুরের দিকে, একবার সুরধুনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতে লাগিল।

সুরধুনী বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি কথা না কহিলেও তোমার কতকটা পরিচয় আমি জানিতে পারিয়াছি। ভদ্রসন্তান হইয়া তেমন কার্য্যে কেন তোমার মতি হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাদের দলে অনেক লোক। দিনাজপুরের মহীপাল-কাননের শিবমন্দিরের তলদেশে একটা পাথরের কেল্লা আছে। তোমাদের একটা ভাঙ্গা দল সেই কেল্লার আশ্রয় লইয়াছিল, তুমিও সেই দলে ছিলে। বাটীর লোকেরা তখন কোথায় ছিল, তোমার মুখে আমি তাহা শুনিব; এই মেয়ে দুটী সেখানে কেন ছিল, তাহাও আমি তোমার মুখে শুনিব; এই মেয়ে দুটীর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক, তাহাও আমি তোমার

মুখে শুনিব। এই তিনটী বিষয় শুনিবার জন্যই এই ঘরে তোমাকে আমি আনাইয়াছি, তোমার গলায় পৈতা আছে, তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান, গায়ত্রী ভুলিয়া গিয়াছ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তথাপি ব্রহ্মবীর্য্যে জন্ম, মিথ্যাকথা বলিও না, মিথ্যা বলিলে কি হয়, তাহা তুমি জানো; যদিও ধরা পড়িয়াছ, তথাচ এখনও উপায় আছে, সত্যকথা বল, সত্য বলিলে বিপদের লাঘব হইতে পারে।”

ধর্ম্মানন্দ বলিল, “আমি—আমি—আমি, দিনাজপুরে”—বলিতে বলিতে থামিয়া গেল।

সুরধুনী বলিলেন,“থামিলে চলিবে না, বলিয়া যাও। দিনাজপুরে তুমি কি করিয়াছিলে? তোমার সঙ্গে সেখানে যাহারা ছিল, তাহাদের জনকতককে আমি পাইয়াছি, বোধ করি, সকলকেই পাইয়াছি। আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু আমি অসাধ্যসাধন করিতে পারি, সত্যকথা বলিলে তোমার পক্ষে ভাল হইবে, এরূপ আশা দেওয়া আমার অসাধ্য নহে, কুড়িজন মল্লকে কাছারীর প্রাঙ্গণে তুমি দেখিয়াছ, তাহারা এই জমিদারীর প্রজা, তাহারা অনেক সত্যকথা বলিয়াছে, সেইজন্য তাহাদিগকে বন্ধন করা হয় নাই; তুমি যদি সত্যকথা বল, তাহা হইলে এইদণ্ডে তুমিও বন্ধনমুক্ত হইবে। সত্যকথা বল, আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমাকে অবিশ্বাস করিলে তোমার নিজের অমঙ্গল ডাকিয়া আনা হইবে। এখনও আমি তোমাকে মিষ্টকথা বলিতেছি, মিথ্যাকথা ধরা পড়িলে তখন আর আমার এ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে না; আমি তখন আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিব। তোমাকে এখানে আনিবার অগ্রে তোমার তুল্য

আর চারিজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহারা মিথ্যা-কথা বলিয়া গিয়াছে; তোমার চেহারা দেখিয়া আমি অনুমান করিতেছি, তাহারাও তোমার জ্ঞাতি-কুটুম্ব হইবে; যদিও কুটুম্ব না হয়, অন্ততঃ কোন না কোন সম্বন্ধে তোমরা পাঁচজনে আবদ্ধ, এমন অনুমান করা অসঙ্গত হইতেছে না।”

ধর্ম্মানন্দ বলিল,“যদি—যদি—যদি তুমি আমাকে অভয় দিতে পার, যাহাদের হাতে পড়িয়াছি, তাহাদের হাত থেকে সত্য যদি তুমি আমাকে পরিত্রাণ করিতে পার, তাহা হইলে—”

বলিতে বলিতে ধর্ম্মানন্দ আবার চুপ করিল; সুরধুনীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, মাথা হেঁট করিয়া মৃত্তিকা দর্শন করিতে লাগিল। সুরধুনী বলিলেন,“এই দুটী বালিকা আমাকে বলিয়াছে, তুমি ইহাদের কাকা হও। দশ হাজার টাকা পাইলে ইহাদিগকে তুমি ছাড়িয়া দিবে, টাকা না পাইলে ছাড়িবে না, এই কথা তুমি বলিয়াছিলে, বালিকাদের মুখে আমি শুনিয়াছি; হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটে ইহাদের বাড়ী ছিল; সত্য যদি তুমি ইহাদের কাকা হও, তবে তোমারও বাড়ী সেই গ্রামে। সেই গ্রাম হইতেই চোরেরা এই দুটী মেয়েকে চুরী করিয়া আনিয়াছিল, মহালয়া আমাবস্যার রজনীতে আমি ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। তোমার দলে যে সকল লোক দিনাজপুরের পাতাল-দুর্গে লুকাইয়া ছিল, মেয়ে দুটীকে তাহারা বলিয়াছিল, তাহারা মনুষ্য নহে,—ভূত!—আমি বোধ করি, সেই সকল ভূত তোমাদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে। যে কুড়িজন মল্লের কথা বলিলাম, তাহারাও দিনাজপুরে ভূত সাজিয়াছিল। বালিকারা বলিয়াছে, ভূতের দলে কেবলমাত্র তুমিই মনুষ্য

ছিলে; এখন ভূতের দলে ভূত হইয়াছ, আমি ভূত ঝাড়াইতে জানি। এখনও যদি তুমি সত্যকথা বল, তাহা হইলে তোমাকে আমি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব।"

মেয়ে দুটীর প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া ধর্ম্মানন্দ বলিল, "আজ আমি কোন কথা বলিতে পারিব না—আপনার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইলে যতদূর আমি জানি, তাহা প্রকাশ করিতে পারিব।"

মনে মনে হাসিয়া সুরধুনী বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোক, তোমার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিব, সেটা ভাল দেখায় না। যে ঘরে তোমরা ছিলে, সেই ঘরে চারিজন ব্রাহ্মণকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এগার জন অপরজাতীয় লোক সেই ঘরে আছে, তুমি এখন সেই ঘরে যাইতে পার। আগামী কল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় আমি স্থির করিব।"

বন্দীকে এই কথা বলিয়া সুরধুনী দেবী গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। দ্বারের বাহিরে দ্বারপালেরা ছিল, তাহাদিগকে বলিলেন, "যে ঘর হইতে ইহাকে আনিয়াছ, সেই ঘরে লইয়া যাও। দ্বারে দস্তুরমত চাবী বন্ধ করিও, যে চারিজনকে অন্য ঘরে রাখিয়াছ, সে ঘরেও চাবী দিতে ভুলিও না।"

দ্বারপালেরা ধর্ম্মানন্দকে লইয়া গেল, সুরধুনী পুনর্ব্বার গৃহদ্বার বন্ধ করিলেন, মনে করিলেন, লোকটা ভারী তুখোড়, বালিকাদের সাক্ষাতে কোন কথা বলিবে না, ইহাই তাহার মৎলব; নির্জ্জনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চায়। দুষ্টলোকের সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কহিলে, নির্জ্জনে তাহার কথা শুনিলে কোন ফল হইবে না। আমার কাছে একরূপ বলিবে, পুলিসে আর

একরূপ বলিবে, আদালতে অন্যরূপ সুর ধরিবে। আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি, পুলিসের লোকের কাছে তাড়নার ভয়ে এক-প্রকার কবুল করিয়া আদালতে গিয়া অনেক বদ্‌মাস সমস্তই অস্বীকার করে। নির্জ্জনে উহার কথা শুনা হইবে না, সাক্ষী রাখা দরকার।

সুরধুনী এইরূপ ভাবিতেছেন, ছলছল-চক্ষে তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া সরোজিনী বলিল, "কেন মা, এখানকার লোকেরা আমাদের কাকাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে কেন?" বিনোদিনীও চক্ষের জল ফেলিয়া ঐ প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিল।

কি উত্তর দিবেন, একটু চিন্তা করিয়া সুরধুনী বলিলেন, "তোমাদের কাকা ভূতের দলে ভূত হইয়াছিল, যাহারা ভূত ধরিয়াছে, তাহারা তাহাই মনে করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তোমরা ভাবিয়াছিলে তোমাদের কাকা মনুষ্য, আমিও সাক্ষাতে দেখিলাম মনুষ্য; কিন্তু যাহারা ধরিয়াছে, তাহারা হয় ত মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারে নাই কিম্বা হয় ত সেই ভূতেরাও মনুষ্য। যে কয়েকটাকে দেখিয়া তোমরা ভূত মনে করিয়াছিলে কিম্বা তাহারাই আপনাদিগকে ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, সত্য সত্য হয় ত তাহারা ভূত নহে। ভূতের আকার থাকে না; ভূতেরা রাত্রিকালে পরের ধন চুরী করিতে বাহির হয় না; তোমরা ছেলেমানুষ, যে যাহা বলে, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর। দিনাজপুরে তোমরা আমাকে বলিয়াছিলে, ভূতেরা রাত্রিকালে চরা করিতে যায়, চরা করিয়া রাশি রাশি জিনিস লইয়া ফিরিয়া আসিত, তাহা তোমরা জানিতে না, চরা-করা ভূতেরা চোরা ভূত, তাহারা চোর;—চোরের চেয়েও বড়;—

তাহারা ডাকাত। তাহারাই তোমাদের দুটীকে ত্রিবেণীর নিকট হইতে চুরী করিয়া আনিয়াছিল।"

সজলনয়নে সরোজিনী বলিল, "তুমি আমাদের মা, তুমি কি আমাদের কাকাটীকে ছাড়াইয়া লইতে পারিলে না? তোমার পায়ে পড়ি, কাকার বাঁধন খুলিয়া দিও, তুমি এখানে আছ বলিয়া কাকা আমাদের সঙ্গে একটীও কথা কহিল না। কথা কহিবে ভাবিয়া কতবার আমাদের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া একটী কথাও ফুটিতে পারিল না, ভয়ে পারিল না কিম্বা লজ্জায় পারিল না, তাহা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু এইবার যখন তুমি তাহাকে দেখিবে, তখন তাহার বাঁধন খুলিয়া দিয়া আমাদের কাছে আনিও।"

সুরধুনী বলিলেন, "সে যদি আমার কাছে সব সত্যকথা বলে, তাহা হইলে আমি তাহার বাঁধন খুলিয়া দিব, সে যদি সত্য তোমাদের কাকা হয়, সত্য যদি তাহার নাম ধর্ম্মানন্দ হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহাকে তোমাদের কাছে আনিব।"

বালিকারা চক্ষের জল মুছিয়া নিশ্বাস ফেলিল, শিশু কিংশুক তাহাদের তিনজনের মুখের দিকে চাহিল, যে সকল কথা হইল, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। প্রভুভক্ত মুস্তফী সেই সময়ে সুরধুনীর নিকটে আসিয়া লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কুঁ কুঁ কুঁ কুঁ রব করিতে লাগিল, গায়ে হাত বুলাইয়া সুরধুনী তাহাকে আদর করিলেন।

খানিক পরে কে একজন আসিয়া সেই ঘরের দরজায় ঠুক্ ঠুক করিয়া তিনবার আঘাত করিল; সঙ্কেত বুঝিয়া সুরধুনী

দ্বার খুলিয়া দিলেন, প্রবেশ করিলেন বড়বাবু। বালিকাদের মুখে তখন ঘোমটা ছিল না, বড়বাবুকে দেখিয়া তাহারা সে স্থান হইতে সরিয়া পার্শ্বের অন্য একটী ঘরে প্রবেশ করিল। কিংশুক আর মুস্তফী সেইখানে রহিল।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজিকার তদন্তের কিরূপ ফল?"

সুরধুনী বলিলেন, "লোকেরা খুব পাকা, কোন কথাই মানাইতে পারা গেল না; বামাল গ্রেপ্তার হইয়াছে,কোন সাফাই নাই, দলে আমি ছিলাম না, সে কথা বলিবার উপায় নাই, তথাপি বজ্জাতী ছাড়ে না। একটা লোক কল্য আমাকে নির্জনে কিছু বলিবে স্বীকার করিয়া গিয়াছে।"

বড়বাবু কহিলেন, "সে কথাও নিতান্ত মন্দ নয়, যাহাদিগকে আপনি আনিতেছেন, চেহারায় তাহারা ভদ্রসন্তান, পৈতা-প্রমাণে তাহারা ব্রাহ্মণ; মানের দায়ে—প্রাণের দায়ে আপনার কাছে সত্যকথা বলিতে পারে; সত্য না বলিলেও নিস্তার পাইবে না, ইহাও তাহারা জানিতেছে, তথাপি বজ্জাতী খেলিতেছে। একজন নির্জ্জনে কবুল করিতে চাহিয়াছে, তাহাই ভাল, নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে আপনি সম্মত হইয়াছেন তো?"

সুরধুনী বলিলেন, "তাহার সাক্ষাতে সম্মতি অসম্মতি কিছুই জানাই নাই; কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছি, নির্জ্জনে তাহার কথা শুনিব না,যে ঘরে পূর্ব্বে তাহাকে রাখা হইয়াছিল,সে ঘরে আরও এগারজন আছে, তাহাদের গলায় পৈতা নাই, কিন্তু লক্ষণে তাহারা বাবু—সেই বাবুগুলার সাক্ষাতেই আমি প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর শুনিব, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

বড়বাবু কহিলেন,"সে যদি তাহাদের সাক্ষাতে কোন কথা না বলে ?—বলিতে যদি না চায়, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন ?"

সুরধুনী কহিলেন, "বলিতে আমি বাধ্য করিব। যদিও অকৃতকার্য্য হই, পুলিস ডাকিব, পুলিস গিয়া দুই একটু মধু-মোড়া দিলেই তাহার মুখের ফোয়ারা ছুটিবে।"

হাস্য করিয়া বড়বাবু কহিলেন, "ঘটনাস্থলে যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহাদের আবার পীড়ন করিবার প্রয়োজন কি ? বিবেচনা করুন, তাহারা আপনারাই ধরা দিয়াছে। মুখে কোন কথা না বলিলেও, আগুন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, ইহাতে কি আপনি সন্দেহ রাখেন ?"

সুরধুনী কহিলেন,"সে সন্দেহ রাখি না, কিন্তু ডাকাতীর কথা ছাড়া আমার আরও গোটাকতক গুহ্যকথা জানিবার আবশ্যক আছে। বাবু হইয়া ডাকাতী করে কেন, দুটী ভদ্রকুলের কন্যাকে হরণ করিয়াছে কেন, তাহা আমি জানিব। আদালতে সে সকল কথা প্রকাশ করিবার আবশ্যক না হইলে প্রকাশ করিব না। ডাকাতী অপরাধেই তাহারা সাজা পাইবে, যাহাদের কন্যা, তাহাদের জাতিতে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শিবে না। একটী বালিকার মুখে আমি শুনিয়াছি, তাহারা ব্রাহ্মণের কন্যা,—দুটী সহোদরা। আমি তাহাদের মাতা-পিতার সন্ধান করিব, সন্ধান যদি না হয়, আমি তাহাদের পিতৃস্থলে—না না, মাতৃস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উপযুক্ত পাত্রে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব।" এই বলিয়াই সুরধুনী একটু হাস্য করিলেন।

অন্যমনে বড়বাবু কি চিন্তা করিলেন, তাঁহাদের উপাধি মহাপাত্র, জাতীয় উপাধি চট্টোপাধ্যায়। মহানন্দবাবুর পিতামহ নবাব-

সরকারে মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন, মন্ত্রীকে সেকালের কথায় পাত্র বলিত। মহানন্দবাবুর পিতামহ একজন নবাবের প্রধান মন্ত্রী- ছিলেন, সেই কারণে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল মহাপাত্র। আমাদের দেশে এমন অনেক বংশ দেখা যায়, বংশের একজন রাজসরকারে কোন উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে কিম্বা অন্য কোন বিশেষ ব্যবসায়ে সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইলে পুরুষানুক্রমে সেই পদের ও সম্ভ্রমের একটা উপাধি চলিয়া আইসে। অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তাহার মধ্যে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভবানন্দ মজুমদার। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর শাহা তাঁহাকে রাজা করিয়াছিলেন, সেই ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগর-রাজবংশের আদিপুরুষ। তিনি ভট্টনারায়ণবংশীয় বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশতিলক। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মজুমদার উপাধিতে পরিচিত ছিলেন না, বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিতেও পরিচিত ছিলেন না, রায় উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপুরুষের দুটী উপাধিই লুপ্ত ছিল। আজি পর্য্যন্ত সেই বংশের রাজারা রায় উপাধিতেই গণ্য হইয়া আসিতেছেন। মহানন্দবাবুর বংশের মহাপাত্র উপাধিও সেইরূপ। বালিকা দুটী ব্রাহ্মণের কন্যা, এই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দবাবু মনে মনে স্থির করিলেন, ঠিক পরিচয় যদি পাওয়া যায়, আমাদের বংশের সহিত যদি বিবাহ যোগ্য-মিলন হয়, তাহা হইলে আমাদের পরিবারের মধ্যে ঐ বালিকা দুটীকে বধূরূপে গ্রহণ করিলে উত্তম হইবে। মেয়ে দুটী পরমা সুন্দরী। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সুরধুনীকে তিনি কহিলেন, "বালিকাদের মাতা-পিতার সন্ধান হউক আর নাই হউক, সত্য যদি ব্রাহ্মণকন্যা হয়, তাহা হইলে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদানন্দ অবিবাহিত— আমার একটী বিংশতিবর্ষীয় পুত্র আছে, সেটীও—"

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া, ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই, পাশের ঘরের দিকে একবার চাহিয়া সুরধুনী বলিলেন, "হইলে খুব ভাল হইত, কিন্তু বোধ হয়, গোত্র-মিলনে গোলযোগ ঘটিবে।"

কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ গোলযোগ?"

সুরধুনী কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি, আপনাদের কাশ্যপগোত্র, আপনাদের বংশোপাধি চট্টোপাধ্যায়। ঐ দুটী বালিকার মধ্যে যেটী বড়, তাহার মুখে একদিন আমি শুনিয়াছিলাম, উহাদের পিতার উপাধি চট্টরাজ। চট্টোপাধ্যায় আর চট্টরাজ একই কথা, সেই জন্যই বলিতেছি, গোত্রমিলনে গোল হইবে। তবে যদি বালিকার ঠিক জানা না থাকে, অন্য লোকে যদি মিথ্যা করিয়া উপাধি উল্টাইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কোন কথা নাই। উল্টাইয়া লওয়াই কিছু সম্ভবপর, যে সকল লোকের কাছে বালিকারা ছিল, বুঝিতেই পারিতেছেন, তাহারা যে সত্যকথা বলে না, ইহাই নিশ্চয়। যাহাই হউক, কার্য্যক্ষেত্রে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সে রাত্রে আর বেশী কথা হইল না, বড়বাবু বাহির হইয়া গেলেন, বালক-বালিকাগুলিকে লইয়া সুরধুনী শয়ন করিলেন।

নবম কাণ্ড।

রজনীপ্রভাত হইল। সুরধুনীদেবী আপন মনে একটী নূতন কল্পনা স্থির করিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে মহানন্দবাবু এক-

বার সুরধুনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চুপি চুপি বলিলেন,“দারোগা আসিয়াছিল, বন্দিগণের নূতন এজাহার কতদূর হইয়াছে, তাহা দেখিতে চাহিয়াছিল, যদি আসামীগণকে চালান করা এখন কর্ত্তব্য হইতেছে না, তথাপি হুজুরে রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য,” এই কথা বলিয়াছিল। দারোগা সরফরাজী চায়, ছোটবাবু তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, “নূতন কথা এখনও কিছু প্রকাশ হয় নাই, এক সপ্তাহ পরে হইবার সম্ভাবনা আছে। দারোগা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সন্তুষ্ট হইয়া যায় নাই।”

একটু হাসিয়া সুরধুনী বলিলেন, “সে সকল লোকের হস্ত অপবিত্র করিয়া দিলেই যতদিন ইচ্ছা ততদিন চুপ করাইয়া রাখা যায়, এজাহার জানিতে আইসে নাই, সেলামী লইতে আসিয়াছিল, আমার এইরূপ বিশ্বাস।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া বড়বাবুর সহিত চুপি চুপি তিনি কি পরামর্শ করিলেন, বড়বাবু চলিয়া গেলেন।

কুকুরেরা মানুষ চিনিতে পারে। পল্লীগ্রামে ইতরলোকের বাড়ীতে যে সকল কুকুর থাকে, অহরহঃ ময়লা কাপড়পরা কাদামাখা কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দর্শন করে, ফর্সা কাপড়পরা ভদ্রলোক দেখিলে তাহারা ভেউ ভেউ করিতে করিতে তাড়া করিয়া যায়। সহরের ভদ্রপল্লীতে ভদ্রলোকের গৃহে যে সকল কুকুর থাকে, তাহারা কদাকার অপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি দেখিলে, ভয়ঙ্কর রব করিয়া সেই সকল লোককে তাড়াইয়া দিতে ব্যস্ত হয়। সুরধুনী দেবীর মুস্তফী সেই প্রকারে অভ্যস্ত। বন্দীদিগকে যখন তাহার সম্মুখে আনা হইয়াছিল, তাহাদের লক্ষণ বুঝিয়া মুস্তফী তখন ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির হইয়াছিল, মহানন্দবাবু মধ্যে মধ্যে আইসেন যান, মুস্তফী কিন্তু কিছুই বলে না, অপরিচিত মূর্ত্তি হইলেও তাঁহাকে

দেখিয়া চুপ করিয়া শান্ত হইয়া থাকে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অধিক, মানুষের গাত্রের আঘ্রাণ লইয়া ভাললোক মন্দলোক বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। রাত্রিকালে মুস্তফী নিদ্রা যায় না, দিনমানে যেন এক একবার অল্প অল্প নিদ্রা যায়, তাহার ভাব দেখিয়া সুরধুনীদেবী সমস্তই বুঝিতে পারে।

বালিকাদুটীকে, বালকটীকে আর মুস্তফীকে লইয়া যে ক্ষুদ্র মহলে সুরধুনীদেবী আশ্রয় লইয়াছেন, সেই মহলের একটী ঘরের দক্ষিণদিকে দুটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ। সেই গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইলে কাছারীবাড়ীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ বেশ দেখা যায়; সেই দিন বেলা চারিদণ্ড থাকিতে সরোজিনীকে আর বিনোদিনীকে সেই দুই গবাক্ষের দ্বারে দাঁড় করাইয়া সুরধনী দেবী সেই ঘরের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া শিশু কিংশুক পায়ে পায়ে বেড়াইতে লাগিল। সুরধুনীর বামজানুর নিকটে ঊর্দ্ধমুখে মুস্তফী।

বালিকারা দেখিতেছে পরিষ্কার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণে জনপ্রাণী নাই, যদি কেহ থাকিত, তথাপি বালিকাদুটীকে কেহ দেখিতে পাইত না। যেরূপে বালিকাদুটীকে দাঁড় করান হইয়াছে, তাহাতে তাহারা বাহিরের বস্তু দেখিতে পায়, বাহিরের লোক তাহাদিগকে দেখিতে পায় না—এইরূপ প্রচ্ছন্ন।

অর্দ্ধদণ্ড পরেই প্রাঙ্গণে জনকতক লোক সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইল, মস্তকগণনায় তাহারা কুড়িজন। বালিকারা সেই কুড়িজনকে দেখিয়া, যেন কতই ভয় পাইয়া, গবাক্ষের নিকট হইতে সরিয়া সুরধুনীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরধুনী বলিলেন, "যেখানে ছিলে, সেইখানে যাও, কোন ভয় নাই, লোক-

গুলাকে খুব ভাল করিয়া দেখ, আর কোথাও যদি ঐ রকম চেহারা দেখিয়া থাক, ভাল করিয়া মনে কর, একটু পরে আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব।"

অল্প অল্প কাঁপিতে কাঁপিতে বালিকারা আবার গবাক্ষের ধারে গিয়া অঙ্গ লুকাইয়া কেবল গবাক্ষরন্ধ্রে চক্ষু দিয়া রহিল; লোকেরা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখানে কাছারীর অন্য লোক ছিল না, বালিকারা খানিকক্ষণ তাহাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া আবার সুরধুনীর নিকটে আসিয়া সভয়-মৃদুকম্পিতস্বরে বলিল, "আর আমরা ওদিকে যাইব না, আমাদের ভয় করে।" সুরধুনী হাস্য করিলেন, একটু পরে বালিকাদুটীকে আবার বলিলেন, "এবার যাও, এবারে আর তাহারা সেখানে নাই।" বালিকারা সুরধুনীর অবাধ্য হয় না, কাঁপিতে কাঁপিতে আবার সেইদিকে গেল, সেইরূপ ভিত্তিগাত্রে অঙ্গ লুকাইয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিল। সত্য সত্যই সে সকল লোক সেখানে নাই, আর একদল নূতন লোক। প্রথমে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের হস্তে বন্ধন ছিল না, এবার যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের সকলেরই দুই দুই হস্ত পশ্চাদ্দিকে বাঁধা; প্রথম দল অপেক্ষা এই দলের লোকসংখ্যা অধিক। বালিকারা তাহাদের দেখিল, আবার সুরধুনীর কাছে আসিল। সুরধুনী একটু রুক্ষস্বরে তাহাদিগকে বলিলেন, "একবার আসিতেছ, একবার যাইতেছ, যেন ছায়াবাজীর পুতুল, কেন অস্থির হও? আবার গিয়া দেখ।"

বালিকারা আবার মৃদু পদে সেইদিকে গেল;—দেখিল, আর একদল নূতন লোক, তাহাদেরও উভয় হস্ত রজ্জুবদ্ধ।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতেছিলেন, ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইল,

কাছারীর প্রাঙ্গণ পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার হইল, একজনও আর সেখানে রহিল না। বালিকাদের মনে ভয় হইয়াছিল, তখন একটু ভরসা হইল, ভরসা হইল বটে, কিন্তু সুরধুনী তাহাদের মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, ভয় তাহাদের সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই।

দাসী আসিয়া সেই মহলের দুটী ঘরে বাতী জালিয়া দিয়া গেল। সুরধুনীদেবী সেইখানে বালিকাদুটীকে নিকটে বসাইয়া একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যাহাদিগকে তোমরা দেখিলে, তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছ ?"

সরোজিনী বলিল,"সকলকে চিনিতে পারি নাই ; তাহাদিগের মধ্যে যাহারা দিনাজপুরে ছিল, তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছি, কিন্তু চিনিতে পারিয়া ভয় হইয়াছে !"

বিনোদিনী বলিল, "তাহারা ভূত ; এখানে আসিয়া মানুষ হইয়াছে, আমি বড় ভয় পাইয়াছি।"

সুরধুনী বলিলেন, "সকলেই মানুষ, একটাও ভূত নয় ; ভূতের আকৃতি নাই ; সকল দেশে ভূতের গল্প আছে, কিন্তু সত্য সত্য কালো কালো ভূত মাঠে ঘাটে বেড়ায়, সকলে সে কথা বিশ্বাস করেন না। দিনাজপুরে যাহারা তোমাদিগকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারা আপনাদিগকে ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল ; তোমরা ছেলেমানুষ, তাহাতেই বিশ্বাস করিয়াছিলে। যাহাকে তোমরা কাকা বল, সে লোকটাও যেমন মানুষ, অন্য লোকেরাও সেইরূপ মানুষ ;—সহজ মানুষ নয়, ডাকাত ! পুলিসের হাতে তাহারা বাঁধা পড়িয়াছে,আর তোমাদের কোন ভয় নাই, এইবার আমি তোমাদের সত্য পরিচয় পাইব। যে ব্যক্তি দিনাজপুরে তোমাদের কাকা হইয়াছিল, তাহার মুখ

হইতেই আমি সত্যকথা বাহির করিব। তোমরা থাকো, আমি চলিলাম, মহলের দরজায় চাবী দিয়া যাইব, কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। মুস্তফী রহিল, কিংশুক রহিল, তোমাদের কোন ভয় নাই। খাবার সামগ্রী প্রস্তত আছে, যখন ইচ্ছা খাইতে পারিবে। শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিব, আমি আসিবার পূর্ব্বে যদি তোমাদের ঘুম পায় ঘুমাইও, আমি আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইব।"

বালিকাদুটীকে এই কথা বলিয়া, দরজায় চাবী লাগাইয়া, সুরধুনীদেবী সে মহল হইতে বাহির হইলেন। রাত্রি একপ্রহর।

দশম কাণ্ড।

কাছারীবাড়ীর যে ঘরে বাবু-ডাকাতেরা বন্দী, সুরধুনীদেবী সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। বন্দীখানায় স্ত্রীলোক আসিল, ইহা দেখিয়া বন্দীরা চমৎকৃত হইল, একটী লোক কিন্তু বিস্ময় বোধ করিল না; সেই লোকটিই ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজ, তার কাছেই সুরধুনীর দরকার।

ধর্ম্মানন্দকে সুরধুনী পূর্ব্বে চিনিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার নিকটে গিয়া বসিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "কেমন, এখন ত নির্জ্জন হইয়াছে? এখন তুমি তোমার মনের কথা প্রকাশ করিতে পার কি না?"

ধর্ম্মানন্দকে লইয়া, সে ঘরে তখন ১২ জন কয়েদী। ১৬ জন ছিল, তারি ৪জনকে অন্য অন্য ঘরে প্রেরণ করা হইয়াছে, বাকী এই ১২ জন। প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজ বক্র-নয়নে

১১ জন সঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দৃষ্টিপাতের ভাব বুঝিতে পারিয়া সুরধুনী বলিলেন, "উহারা তোমাদেরই দলের লোক। উহাদের কাছে লজ্জার কারণ কিছুই নাই, ভয় করিবার কারণও কিছু থাকিতে পারে না। যাহা তুমি বলিবে, আমি যদি প্রকাশ না করি, তাহা হইলে তোমার দলের এই সকল লোকের দ্বারা সে সকল কথার একটী বর্ণও প্রকাশ হইবে না, নিশ্চয় করিয়া ইহা আমি বলিতে পারি। তোমার মুখে ব্যক্ত হইবে, তোমার কার্য্যকলাপের গুহ্য কথা। আদালতে সেই সকল কথা উঠিলে তোমার পক্ষে যদি মন্দ হইবার আশঙ্কা থাকে, উহারাও নিষ্কৃতি পাইবে না। তবে তুমি কিসের ভয় কর? বল, স্বচ্ছন্দে বল, নির্ভয়ে বল, ইংরাজী আইনের মর্ম্ম এই যে, একজন অপরাধী যদি সত্যকথা বলিয়া অন্য অপরাধিগণকে জড়াইয়া দিবার সুবিধা দেখাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। তুমি যাহাতে মুক্তি পাও, অবশ্যই আমি সে চেষ্টা করিব। আমি স্ত্রীলোক, আমি আদালতে যাইব না, পুলিসের সঙ্গেও দেখা করিব না। তবে আমি কি চেষ্টা করিব, এমন যদি ভাব, তোমার সেই ভাবনা দূর করিবার নিমিত্ত আমি শপথ করিয়া বলিতেছি। এই কাছারীর বাবুরা আমার পরম বন্ধু। আমার কথা তাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহাদের কাছারীতেই ডাকাতী হইয়াছে। সত্য বলিতে গেলে তাঁহারাই ফরিয়াদী, তুমি যদি সত্যকথা বল, তাহা হইলে তোমাকে তাঁহারা বাঁচাইবেন। আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিব।"

ধর্ম্মানন্দ একবার বিস্ফারিত-নেত্রে সুরধুনীর মুখের দিকে

চাহিল, আর একবার সঙ্গীগণের দিকে সেই চক্ষু ফিরাইল। কি যেন মনে করিয়া সঙ্গীরা কাঁপিয়া উঠিল। সুরধুনী বলিলেন, "উহারা কাঁপিতেছে দেখিতেছ, উহারা ভাবিতেছে, সত্যকথা বলিলে তুমি খালাস পাইবে, উহারা সাজা পাইবে; কিন্তু আমি উহাদিগকেও অভয় দিতে পারি। উহারাও যদি সত্যকথা বলে, উহাদেরও দণ্ডলাঘব হইবে।"

ভরসা পাইয়া. ধর্ম্মানন্দ তখন কাটা কাটা, ছাড়া ছাড়া, কতকগুলি কথা বলিল। তাহার মধ্যে যেগুলি সত্য, সুরধুনী তাহা বুঝিলেন, যেগুলি মিথ্যা, সেগুলি ধরিতেও তিনি অক্ষম হইলেন না। হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন, "সত্য বলিতে বলিতে মিথ্যার আবরণ কেন রাখ? সরোজিনী আর বিনোদিনী সত্য সত্য তোমার ভাইঝী কি না, তাহা আমি জানিতে চাই। ভদ্র-কুলবালারা ডাকাতের দলে কেন আসিয়াছে, কে তাহাদিগকে হরণ করিয়াছে, তাহা জানিতে না পারিলে মকর্দ্দমা অঙ্গহীন হইবে। সরোজিনী আমাকে বলিয়াছে, তোমরা বলিয়াছ, তাহাদের দাম আছে। অল্প দাম নয়, দশ হাজার টাকা। উহাদের কোন অভিভাবক যদি দশ হাজার টাকা দিতে পারে, তাহা হইলে তোমরা উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। কেমন, এই কথা সত্য কি না? সত্য যদি তুমি উহাদিগের কাকা হও, তাহা হইলে, তুমি কখনও ঐরূপ দাবী করিতে পার না। সেই জন্যই আরও সন্দেহ হইতেছে। সত্য করিয়া বল, উহাদের সত্য পরিচয় কি? ডাকাতী অপরাধ মূল-মকর্দ্দমা। কন্যাহরণের মকর্দ্দমা স্বতন্ত্র। সেই কারণেই বালিকা দুটীর সত্য পরিচয় আমি জানিতে চাই।"

মাথা হেঁট করিয়া, ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া, পুনরায় মুখ তুলিয়া ধর্ম্মানন্দ বলিল, "গ্রাম-সম্পর্কে কাকা আমি বটে, উহাদের পিতার সহোদর আমি নই; আমার নামও ধর্ম্মানন্দ নয়; বালিকাদের পিতার উপাধিও চট্টরাজ নয়, আমিও চট্টরাজ নই। আমাদের দলের লোকেরা স্নানের ঘাট হইতে যখন উহাদিগকে হরণ করে, তখন আমি সে দলে উপস্থিত ছিলাম না, দিনাজপুরে যখন আমি উহাদিগকে দেখিলাম, তখন চিনিতে পারিয়াছিলাম। দশ হাজার টাকা দাবীর কথা কিছুই আমি জানি না।"

সুরধুনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গলদেশের যজ্ঞসূত্র যদি প্রতারণা না করে, তাহা হইলে তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান; আর তোমার সঙ্গে আর যে চারিজন বাবু আছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণের সন্তান। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ডাকাতের দলে যোগ দিয়াছ কেন, কাহারা তোমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে, তাহাও আমার কাছে প্রকাশ কর। সরোজিনী, বিনোদিনী উভয়ে সহোদরা, সরোজিনী আমাকে সেই কথা বলিয়াছে। সরোজিনীর পিতা তোমাদের দলভুক্ত কি না, তাহাও তোমার মুখে আমি শুনিব; শুনিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে; অসংকোচে সে কথাও তুমি আমাকে বল।"

ধর্ম্মানন্দের নাম ধর্ম্মানন্দ নয়, তথাপি এখনও তাহাকে ধর্ম্মানন্দ বলিয়া জানিতে হইতেছে। বেশীকথা না বলিয়া ধর্ম্মানন্দ বলিল, "সরোজিনীর পিতা ইষ্টনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তিনি জীবিত আছেন। আমাদের দলের সঙ্গে তাঁর কোন সংশ্রব নাই।"

সূত্র প্রাপ্ত হইয়া সুরধুনী বলিলেন, "এইবার তুমি সত্যকথা বলিয়াছ। সরোজিনীর পিতা নির্দ্দোষ, টাকার লোভে

সেই ভদ্রলোককে ফাঁসাইতে তুমি ইচ্ছা কর না, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। গ্রাম-সম্পর্কে সরোজিনীর পিতা তোমার ভ্রাতা। কোথায় তোমাদের গ্রাম ?”

ধর্ম্মানন্দ নীরব। সুরধুনী আবার বলিতে লাগিলেন, “সরোজিনী আমাকে বলিয়াছে, তাহার একটু একটু মনে আছে, হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটে তাহাদের পিত্রালয় ; গ্রামের নাম বলিতে পারে নাই, নামটা তার মনে নাই, তুমি যখন গ্রাম-সম্পর্কের কথা বলিতেছ, তখন অবশ্যই তোমারও নিবাস সেই গ্রামে ; অতএব আমি তোমাকে গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

নতমস্তকে অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া, শেষে এক নিশ্বাস ফেলিয়া ধর্ম্মানন্দ বলিল, “গ্রামের নামে এখন আর আমার কি দরকার, সে গ্রামে আমাদের আর কিছুই নাই ; জমীদারী ছিল, তাহাও গিয়াছে, ভিটামাটী সমভূমি হইয়াছে, পাঁচ বিঘা ভদ্রাসন, সেই ভদ্রাসনে এখন অন্যলোকে বাগান করিয়াছে, সে গ্রামের নাম আমি বলিতে পারিব না।”

সুরধুনী বলিলেন, “বলিতে পারিবে না কেন বল, বলিবে না, তাহাই বল। আচ্ছা, সরোজিনীর পিতার বাস সেই গ্রামে এখনও আছে ?”

ধর্ম্মানন্দ বলিল, “আছে কি না, অনেক দিন আমরা দেশ-ছাড়া হইয়াছি, সেখানকার কোন খবর রাখি না।”

সুরধুনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেশছাড়া হইয়া কোথায় গিয়াছ? অন্য কোন জায়গায় নূতন বাড়ী করিয়াছ কিম্বা দল বাঁধিয়া বনে বনে বেড়াইতেছ, স্থানে স্থানে গৃহস্থ লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছ, ইহাই কি এখন তোমাদের কার্য্য ?”

ধর্ম্মানন্দ উত্তর করিল, "আমাদের অদৃষ্ট বড় মন্দ ; অদৃষ্টের দোষে কার্য্য ঐ প্রকার হইতে পারে, কিন্তু বনে বনে বেড়াই না, এই বরিশাল জেলার একটা অপ্রসিদ্ধ পল্লীগ্রামে একখানা বাড়ী করিয়াছি, আমরা পাঁচ জনেই সেই বাড়ীতে থাকি, সেখানে আমাদের পরিবার আছে, বৎসরের মধ্যে দুইমাস আমরা বাড়ীতে স্থির হইয়া বাস করিতে পারি না, বাহিরে বাহিরেই দিন কাটে।"

সুরধুনী বলিলেন, "দিন কাটে, আর রাত কাটে তাহা বুঝিলাম। আচ্ছা, পাঁচ জনে তোমরা বরিশালের নূতন বাটীতে থাক, কে কে পাঁচ জন ?"

ধর্ম্মানন্দ বলিল, "আমার সঙ্গের যে চারি জনকে এখানকার অন্য ঘরে রাখা হইয়াছে, সেই চারিজন আর আমি।"

সুরধুনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে চারিজনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?"

ধর্ম্মানন্দ উত্তর করিল, "সম্পর্ক ভাল। একজন আমার সহোদর, একজন আমার খুল্লতাত আর দুইজন আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া সুরধুনী কহিলেন, "বাঃ!—তোমাদের জীবনচরিত বোধ হয়, বড় চমৎকার হইবে! লোকে যেমন মন দিয়া মনোরঞ্জন ইতিহাস শ্রবণ করে, সেইরূপ মন দিয়া তোমাদের জীবনচরিত শ্রবণ করিতে আমারও বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। ইতিহাস বর্ণনা করিতে তুমি বাধ্য, বল তোমাদের ইতিহাস, মন দিয়া আমি শুনিব।"

ধর্ম্মানন্দ দুই তিনবার মাথা হেঁট করিয়াছিল, দুই তিনবার মুখ তুলিয়াছিল, সুরধুনীদেবীর শেষ কথা শুনিয়া আবার মাথা

হেঁট করিল। সুরধুনী বলিলেন, "লজ্জা কর কাহার কাছে, যে সকল কার্য্য তোমরা কর, তদপেক্ষা লজ্জাকর কার্য্য সংসারে আর নাই। সে কার্য্যে লজ্জা হয় না, বংশের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতে লজ্জা আইসে কেন? লজ্জা ত্যাগ কর। মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া আমার মুখপানে চাও, বংশের জীবনকাহিনী আমার কাছে বর্ণনা কর। পূর্ব্বেই আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার কাছে খোলসা কথা বলিলে তোমার লজ্জারক্ষা হইবে, সকল দিক্ বজায় থাকিবে।"

ধর্ম্মানন্দ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; মনে মনে অনেক ভাবিয়া দেখিল, কোন দিকে কোন উপায় নাই, চুপ করিয়া থাকিলে যে বিপদ্, কথা কহিলেও সেই বিপদ্, চুপ করিয়া থাকিলে বরং অধিক বিপদের সম্ভাবনা। এই স্থির করিয়া অভাগা ব্রাহ্মণকুমার আপন চিত্তকে দৃঢ় করিল;—কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, কতক লজ্জায় কতক অলজ্জায়, কতক ভয়ে, কতকটা নির্ভয়ে সুরধুনীদেবীর নিকটে আপনাদের তিন পুরুষের বিষম ইতিহাস বর্ণনা করিল, পুলিসের কিম্বা আদালতের দস্তুরে কথা কহিতে হইলে অল্পকথার জন্য বিস্তর কথা বলিতে হয়। জেরার উপর জেরা সওয়ালের উপর সওয়াল, জবাবের উপর জবাব, ইত্যাদি ইত্যাদিতে কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যায়, ঘোর ফের অনেক থাকে; সেই পদ্ধতিতে ধর্ম্মানন্দের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিলে পাঠক মহাশয়ের প্রীতিকর হইবে না, এই কারণে সেই সকল কথার স্থূল স্থূল মর্ম্ম, সংক্ষেপে সংক্ষেপে এই স্থলে প্রকাশ করা হইল।

ধর্ম্মানন্দ বলিল, "আমার পিতামহের পিতা কাশীনাথ বন্দ্যো-

পথ্যায় একজন সামান্য অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন, ঘরকতক শিষ্য-যজমান ছিল, ক্রিয়াকর্ম্ম করাইয়া তাহাদের দ্বারে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতে অতি কষ্টে দিন নির্ব্বাহ হইত। বিঘাকতক ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহাতে ধান্য হইত, প্রজারা সেই সকল জমি চাষ করিয়া অর্দ্ধেক ধান্য প্রদান করিত, সেই ধান্যে সংবৎসরের খোরাক চলিত। কাশীনাথ অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, কষ্টে সংসার-নির্ব্বাহ করিয়াও মৃত্যুকালে পাঁচশত টাকা নগদ জমা রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমার পিতামহের তিন সহোদর; তাঁহারা কেহই ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। শিষ্য-যজমান রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের কাহারও ছিল না। তাঁহাদের পিতার সঞ্চিত নগদ টাকাগুলি এক বৎসরেই উড়িয়া গেল, ব্রহ্মোত্তর জমিগুলি বিক্রয় করিবেন, এইরূপ মৎলব হইয়াছিল; কিন্তু আমার পিতামহী একজন ধনবানের কন্যা ছিলেন, তিনি সেই জমিগুলি নিজনামে খরিদ করিয়া রাখেন, আমার পিতামহ তাহার স্বত্বভোগী হন, তাঁহার অপর দুই সহোদর কতুর হইয়া যান। আমার পিতামহের চারি পুত্র। বিবাহের অগ্রে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে একটী পুত্রের মৃত্যু হয়। আমার পিতা মধ্যম ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুই পুত্র, তাঁহার নিজেরও দুই পুত্র, কনিষ্ঠ অপুত্রক। আমার পিতার দুই পুত্রের মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ, আমার নাম মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কনিষ্ঠের নাম বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার জ্যেষ্ঠ, তাত-পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম নরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয়ের নাম ভজহরি বন্দ্যোপাধ্যায় আমার খুল্লতাতের নাম দ্বিবেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। পাপমুখে কত কথাই আজি বলিব,

বলিবার পূর্ব্বে কেন আমার মৃত্যু হয় নাই?" এই কথা বলিতে বলিতে ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজ ওরফে মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় দুইহস্তে নয়ন আবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরধুনী বলিলেন, "এখন আর ক্রন্দন করা বিফল। যে কথা বলিতেছিলে বলিয়া যাও, পাপমুখে পাপকথা বলিতে কষ্ট হইতেছে বুঝিতেছি, এখনও পূর্ব্বপুরুষের পাপের কথা কিছুই তুমি বল নাই। কৃপণ ভট্টাচার্য্যের বংশে পাপপ্রবৃত্তি কিরূপে আসিয়াছিল, কিরূপে তোমরা ডাকাতের দলে মিশিয়াছ, তাহাই আমি শুনিব।"

মুরলীধর বলিল, "পূর্ব্বে বলিলাম, আমার পিতামহী সেই ব্রহ্মোত্তর জমিগুলি নিজ নামে খরিদ করিয়াছিলেন। সে সকল জমি পূর্ব্বের ন্যায় ধান্যভাগে বিলী করা হইত না, অল্প অল্প জমায় প্রজাবিলী করা হইয়াছিল; অধিক আয় হইত না, সংসারে বড়ই কষ্ট। আমার পিতামহ সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া পরের ধনে লোভ করিতে লাগিলেন, তাঁহার দুটী সহোদরও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। প্রথমে সিঁদ কাটিয়া চুরী করিতে শিখিলেন, ক্রমে ক্রমে বড় বড় চোরের সঙ্গে মিলন হইল, বড় বড় চুরী করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহারা প্রকৃত ডাকাত হইয়া উঠিলেন; আমার পিতা ও পিতৃব্যেরাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই পেশা ধরিলেন, সংসারের কষ্ট দূর হইল। ভদ্রাসন পূর্ব্বে ছোট ছিল, অধিক জমি ক্রয় করিয়া তাঁহারা ভদ্রাসন বাড়াইলেন। পাতার ঘর—খড়ের ঘর ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া বড় বড় অট্টালিকা বানাইলেন, বড় বড় জমিদারী কিনিলেন, তাঁহাদের উপাধি হইল বাবু। আমাদের

বাড়ীকে লোকে বাবুদের বাড়ী বলিত, বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হইত, সংসার খুব জলজমাট, জমিদারীর আয় অনেক; তথাপি তাঁহারা পূর্ব্বপেশা পরিত্যাগ করিলেন না, বড় বড় ডাকাতের দলে মিলিত হইয়া কিছুদিন পেশা চালাইয়াছিলেন, বাবু হইয়া অবধি তাঁহাদের আর সেরূপ অধীনতা আর ভাল লাগিল না, অনেক লোক জড় করিয়া নিজেরা দল বাঁধিলেন। অট্টালিকা হইল, জমিদারী হইল, ঘটা করিয়া ক্রিয়াকর্ম্ম হইতে লাগিল, গ্রামের লোকেরা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কেহ কেহ হিংসা করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে অকস্মাৎ গরীবের সংসারে এত সৌভাগ্যের উদয়, কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমাদের বংশের বাবুরা লেখা-পড়ায় মূর্খ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বিলক্ষণ বুদ্ধি ছিল। বাসগ্রামের অথবা নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের কোন গৃহস্থের একগাছি তৃণও তাঁহারা স্পর্শ করিতেন না, এমন কি, হুগলী জেলার কোন স্থানে কাহার বাটীতে কখন তাঁহারা ডাকাতী করেন নাই। জেলার পুলিস অথবা জেলার কোন লোক তাঁহাদিগকে ডাকাত বলিয়া মনে করিত না, সেরূপ কোন লক্ষণও দেখিত না, জেলায় তাঁহারা সাধু ছিলেন। বহু-দূরস্থ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় তাঁহাদের পেশাদারী কারবার চলিত। রাহাজানী হইত, গৃহদাহ হইত, নরহত্যা হইত, কিছুই বাকী থাকিত না, কিন্তু কখনও তাঁহারা পুলিসের হস্তে ধরা পড়েন নাই। যাত্রাদলে যেমন নূতন নূতন ছোকরা ভর্ত্তি হয়, ছোটবেলা হইতে আমরাও সেইরূপে তাঁহাদের দলে ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষানবিশী করিতাম, ক্রমে ক্রমে পাকা হইয়া উঠিয়াছি।"

মৃদুহাস্য করিয়া সুরধুনী কহিলেন, "হাঁ হাঁ, তাহা ত হইতেই

পারে, হইতেই পারে, মহাবনে ব্যাঘ্র-শাবকেরা আপনা হইতেই শীকারী হয়, দৃষ্টান্ত দেখিতে হয় না। গো-মনুষ্য ভক্ষণ করিতে হয় কেহ শিখাইয়া না দিলেও তাহা তাহারা শিখিয়া লয়। গ্রাম্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিড়াল-শাবকেরাও শীকারী হয়, মাতা-পিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়াও হয়, না দেখিয়াও হয়। দেশে একটা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে, 'বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুছ না হোয় তো থোড়া থোড়া' তোমরা যে ক্রমে ক্রমে পাকা হইয়া উঠিয়াছ, তাহা আশ্চর্য্য নয়; বাপ-পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমরা দেখিয়াছ, দেখিয়া দেখিয়া সেই পেশা শিখিয়াছ, ইহা তোমাদের বাহাদুরী নয়; তিন পুরুষের পেশা, অবশ্য উত্তরাধিকার আছে, তোমাদের ছেলেরাও তাহা শিখিতেছে। তোমরা যদি ধরা না পঁড়িতে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও শিখাইয়া শিখাইয়া পাকা করিয়া তুলিতে পারিতে। আচ্ছা, তাঁহারা ডাকাতী করিতেন, কখন কোথাও ধরা পড়েন নাই, তবে তোমাদের এমন দশা কেন হইল, হুগলী জেলার বাড়ীঘর কেন গেল, জমিদারী কেন গেল, বরিশালে আসিয়া তোমরা কেন আশ্রয় লইলে?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুরলীধর বলিল, "তাঁহাদের আমলে কিছুই হয় নাই, কিছুই যায় নাই, সব ঠিক ছিল, লোকের কাছে মান-সম্ভ্রমও বজায় ছিল, বরাবর আমরা বাবু ছিলাম, তাহার পর দুর্দশা। পিতামহেরা লোকযাত্রা সংবরণ করিলেন, পিতার লোকান্তর হইল। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কি জানি কেন গঙ্গা-জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার অপঘাত-মৃত্যুর তদারকে মহা হুলস্থুল পড়িয়াছিল, অনেক টাকা খরচ করিয়া আমাদের অব্যাহতিলাভ হয়। আমার খুড়া মহাশয় আমা-

দের সংসারের কর্ত্তা হইলেন। বলিয়াছি, তাঁহার নাম বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। জ্যেঠা-মহাশয়ের অপঘাত-মৃত্যুর পর তিনি পরামর্শ করিলেন, এ গ্রামে আর থাকা নয়, অনেক লোক শত্রু হইয়াছে, কোন্ দিন ধরাইয়া দিয়া ফ্যাসাদে ফেলিবে। বরিশাল জেলা আমাদের মত লোকের পক্ষে বেশ নিরাপদ্; এখানকার ডেরা-ডাণ্ডা উঠাইয়া সেইখানে বাস করাই ভাল। এই পরামর্শ করিয়া তিনি জমিদারীগুলি বিক্রয় করিলেন, বাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া ইট-কাঠ, আসবাব-পত্র বিক্রয় করিলেন, গ্রামের জমিজমা প্রজাগণকে মোরসী পাট্টা দিলেন, অনেক নগদ টাকা হাতে হইল, আমাদের সকলকে লইয়া বরিশালে বাস করিবার জন্য গ্রাম হইতে বাহির হইলেন। তিন দিন পরে একটা বনের ধারে রাত্রি হইয়াছিল, নিকটে লোকালয় ছিল না, আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, ঝড়-বৃষ্টি আসিযাছিল, মহা দুর্যোগ। কাজে কাজেই সেই বনে আমরা ছিলাম। অনেক রাত্রে একজন ডাকাত সেই বনে প্রবেশ করিয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যায়, ভাগ্যক্রমে কাহাকেও প্রাণে মারে নাই, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আমরা কয়েকটী প্রাণ লইয়া বরিশালে আসিয়াছি। এখানে আমাদের দলে নূতন লোক জুটিয়াছে, পুরাতন দলের সর্দ্দার সর্দ্দার লোকের নামে ডাকে পত্র লিখিয়া খুড়া মহাশয় তাহাদের মুখ চাহিয়া ছিলেন, ৫০।৬০ জন আসিয়াছে, বাকী লোকেরা আইসে নাই। পুরাতন দলে অতি কম দুই শত লোক ছিল; বাকী লোকেরা কোথায় গেল, খুড়া মহাশয় তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি অনুমান করিলেন, পথের মধ্যে সেই দুর্যোগ-রজনীতে যাহারা

আমাদিগকে বনের ভিতর আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাই সন্ধানী লোক, তাহারাই আমাদের পুরাতন দলের সহকারী।"

সুরধুনী কহিলেন, "হাঁ হাঁ, বুঝিলাম, মরা গাঙ কুমীরে ভরা! রূপনারায়ণ নদে কুম্ভীর আছে, ইচ্ছামতী নদীতে কুম্ভীর আছে, রূপনারায়ণে গম্ভীর জল, ইচ্ছামতী মরা; তোমরা এখন ইচ্ছামতীর কুম্ভীর হইয়াছ; সেই কারণেই দিবাভাগে ডাঙ্গার উপর ধরা পড়িয়াছ।"

এই কথা বলিয়া সেই ঘরের অপর এগার জনের দিকে নেত্রনিক্ষেপ করিয়া সুরধুনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারাও কি তোমাদের হুগলীর দলের বাবু?"

মুরলীধর বলিল, "বাবু বটে, কিন্তু ইহারা ব্রাহ্মণ নয়, হুগলী-তেও ইহাদের সকলের বাড়ী নয়; পাঁচজন হুগলীর, দুইজন বাঁকুড়ার, একজন বীরভূমের, তিনজন কৃষ্ণনগরের। ইহাদের মধ্যে তিনজন কায়স্থ, তিনজন সদ্গোপ আর পাঁচজন গোড়-গোয়ালা।"

এ রাত্রে আর কিছু শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া সুরধুনী দেবী সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, দ্বারে চাবী পড়িল।

একাদশ কাণ্ড।

এক পক্ষ অতীত হইল। বন্দিগণকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে বাকী ছিল, এই এক পক্ষের মধ্যে গোপেশ্বরবাবু সেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন, জিজ্ঞাসাই সার। মুরলী-

ধর ব্যতীত আর কেহই সকল প্রশ্নের উত্তর দিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল, উত্তর দিলেও নিস্তার নাই, না দিলেও নিস্তার নাই, তবে কেন নিজ নিজ মুখে বড় বড় পাপের কথা প্রকাশ করা? এই ভাবিয়াই তাহারা নিস্তব্ধ রহিল।

দুই এক দিন অন্তর দারোগা আইসেন, তাঁহাকে যাহা যাহা বলিতে হয়, গোপেশ্বরবাবু বলেন, জমিদারবাবুরা কোন কথা বলেন না। পশ্চাতে দারোগা যেদিন আসিলেন, গোপেশ্বরবাবু সেই দিন তাঁহাকে বলিলেন, "আমার এখানকার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন আপনার কার্য্য আপনি করিতে পারেন।"

সেই দিন ডাকাতগণকে থানায় লইয়া যাইবার কথা স্থির হইল। মুরলীধরকে আদালতে চালান দেওয়া হইবে, কিন্তু আসামী-শ্রেণীতে চালান করা হইবে না, গোপেশ্বরবাবু এই কথা বলিলেন। কুড়িজন মল্লকে বন্ধন করা হয় নাই, মুরলীধরকেও বন্ধনমুক্ত করা হইল। তাহারা একুশ জনে সাক্ষী-শ্রেণীতে গণ্য হইবে। মল্লেরা যদিও ডাকাত, কিন্তু সরস্বতী-পূজার পর-দিন ডাকাতের দলের সঙ্গে তাহারা ধরা পড়ে নাই, পূর্ব্বদিন হইতেই কাছারীবাড়ীতে আটক ছিল। তাহাদের মুখে অনেক কথা ব্যক্ত হইয়াছে। গোপেশ্বরবাবু তাহাদিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছেন, দারোগার নিকটে, মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অথবা জজ-সাহেবের নিকটে তাহারা আপনাদের দোষের কথা স্বীকার করিবে না, সচরাচর সাক্ষীরা যেমন সাক্ষ্য দেয়, সেইরূপ পরিষ্কার পরিষ্কার সাক্ষ্য দিয়া তাহারা বলিবে, "আমরা দস্যুদলের সকলকে চিনি, ডাকাতী করিয়া যখন তাহারা বাহির হয়, তখন অনেক-বার তাহাদিগকে দেখিয়াছি, সাহস করিয়া ধরিতে পারি নাই,

গাছে উঠিয়া বনে লুকাইয়া মুখগুলি চিনিয়া রাখিয়াছি, পুলিস যাহাদিগকে ভয় করে, নিকটে যাইতে সাহস করে না, আমরা তাহাদিগের নিকটে প্রাণ হারাইতে যাইব, তেমন ভরসা আমাদিগের হয় নাই। তাহারা দলে পুরু, আমরা অল্প, এইজন্য নিকটস্থ হই নাই।" এই সকল কথা তাহারা বলিবে। তাহারা ডাকাত, ভবিষ্যতে আর কখনও ডাকাতী করিবে না, কোন ডাকাতের দলে মিশিবে না, জমিদার-সরকারে এই মর্ম্মে একরার লিখিয়া দিয়াছে। কোন ডাকাতের সঙ্গে কখনও যদি তাহারা যোগ দেয়, এমন প্রকাশ পায়, তাহা হইলে জমিদারেরা তাহাদিগকে আপনাদের অধিকার হইতে তাড়াইয়া দিবেন; তাহাদের ঘর-বাড়ী জমিজমা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন, তাহাদিগকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবেন, একরার-পত্রে এইরূপ লেখা আছে, বিচারালয়ে এখন সে কথা প্রকাশ হইবে না, এইরূপ বন্দোবস্ত।

গোপেশ্বরবাবু যখন বালিকাদের কাছে থাকেন, তখন তিনি সুরধুনী দেবী, যখন বাবুদের কাছে থাকেন, তখন তিনি গোপেশ্বর; ডাকাতের কাছে কখনও সুরধুনী, কখনও গোপেশ্বর। জমিদারবাবুরা তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট।

দারোগা মহাশয় সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে দস্তুরমত পাহারা-মোতায়েনে বন্দিগণকে ও সাক্ষিগণকে থানায় লইয়া গেলেন, পরদিন দীর্ঘ রিপোর্ট লিখিয়া আস্‌খাস্ চালান দিলেন। আসামী ও সাক্ষী একসঙ্গে চালান দেওয়ার নাম আস্‌খাস্ চালান। সরস্বতী-পূজার রাত্রে মহানন্দবাবুর কাছারী হইতে ডাকাতেরা যত টাকা লুটিয়া লইয়াছিল, ছোট ছোট বস্তাবন্দী করিয়া সেই

সকল টাকা ডাকাতগণের মাথায় দিয়া চালান করা হইয়াছিল, সে কথা এইখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ডাকাতের দল হুজুরে চালান হইয়া গেল। গোপেশ্বরবাবু বাবুদের বৈঠকখানায় বসিয়া অনেকগুলি গল্প করিলেন। একটী গল্পের মধ্যে তিনি বলিলেন, "ডাকাতের দলে বাবু আছে, তাহারাই সর্দ্দার। বাবু অনেক প্রকার। কলিকাতা সহরে একবার একদল বাবু হইয়াছিল, তাহারা দল বাঁধিয়া গাঁজা খাইত। বাগবাজারে সেই দলের বাবুরা পক্ষীর দল বসাইয়াছিলেন। যাহারা বেশী গাঁজা খাইতে পারিত, তাহারা ময়ূর, ময়না, কাকাতুয়া, কোকিল ইত্যাদি ভাল ভাল পক্ষীর উপাধি পাইত। যাহারা অল্প গাঁজা খাইত, তাহাদের উপাধি হইত—বুলবুলী, টুন্‌টুনী, ছাতারে, ঘুঘু ইত্যাদি। সেই দলের একজন বাবু একপ্রকার ঘর বাঁধিয়াছিলেন, গাঁজার চাল, দোক্তার বেড়া, আফিমের মেজে। সেই ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়া তাঁহারা তামাসা দেখিয়াছিলেন। গাঁজার ধোঁয়ায় বাগবাজার অন্ধকার হইয়াছিল; ঐ তিন প্রকার মশলার গন্ধে চতুর্দ্দিক্ মাতিয়া উঠিয়াছিল। একজন জিলিপীর পাইখানা বানাইয়াছিলেন, একটী বাবু তাঁহার উপর টেক্কা দিবার জন্য রাশীকৃত ছানাচিনি একত্র পাক করিয়া কাঁচাগোল্লা বানাইয়া দুই তিনখানা বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে সন্দেশের ঘুঁটে দিয়াছিল। এখনও অনেক প্রকার বাবু হইতেছে; কিন্তু বাবু-ডাকাত, এটা আমার পক্ষে নূতন।"

গল্প শুনিয়া বাবুরা হাস্য করিলেন। বড়বাবু বলিলেন, "যেমন নূতন, আপনিও তাহার উপর নূতন কৌশল দেখাইয়াছেন। দুরাচার দুর্য্যোধনের উপদেশে পাপিষ্ঠ পুরোচন যেমন বারণাবতনগরে

পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মৎলবে জৌঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আপনিও সাধু অভিপ্রায়ে দস্যু বাধবার নিমিত্ত এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে ধুনা আল্‌কাত্‌রা ইত্যাদি যোগে এক প্রকার অসংখ্য জৌঘর বানাইয়া অগ্নি জ্বালাইয়াছিলেন। সে ফিকির না করিলে ঐ সকল ভয়ঙ্কর ডাকাত কখনই ধরা পড়িত না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আপনাকে পুরস্কার দিবেন, আমরাও আপনাকে একখানি জমিদারী দান করিব। এখন ঐ মেয়ে দুটীকে এখানে আর অধিক দিন রাখা কর্ত্তব্য কি না, তাহাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

গোপেশ্বরবাবু বলিলেন, "সেই দুটী বালিকার উপকার করিতে পারিলেই আমি আমার যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব, অন্য পুরস্কারলাভে আমার প্রত্যাশা নাই। মুরলীধরের মুখে মেয়ে দুটীর পিতার নাম ও বাসগ্রাম আমি জানিয়া লইয়াছি। দস্যু-দলের বিচার শেষ হইয়া গেলে সেই গ্রাম হইতে সেই ব্রাহ্মণকে আমি আপনাদের কাছে লইয়া আসিব। এখন ঐ মেয়ে দুটীকে আপনারা কোথায় রাখিতে ইচ্ছা করেন?"

বড়বাবু বলিলেন, "পূর্ব্বে যাহা আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। আমার সে সঙ্কল্পে আপনি একটা বাধা দেখাইয়াছিলেন, সেই কথা শুনিয়া অবধি আমি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আছি। বস্তুতঃ আমার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলে বড় সুখের বিষয় হইত। তথাপি—"

গোপেশ্বরবাবু বলিলেন, "আপনার সঙ্কল্প অসিদ্ধ থাকিবে না। যখন আমি সন্দেহ রাখিয়াছিলাম, তখন আমার ঠিক পরিচয় জানা ছিল না, ডাকাতের কথায় আমি প্রতারিত হইয়াছিলাম। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ডাকাতের মুখে আমি পূর্ব্বে কোন

কথা শুনি নাই। একটী বালিকা আমাকে বলিয়াছিল, তাহার কাকা ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজ, তাহার পিতাও চট্টরাজ, ইহাই বুঝিতে হইয়াছিল। তাহার পর সেই ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজকে ডাকাতের দলে আমি পাইয়াছিলাম। খালাস পাইবার আশ্বাসে সে আমার কাছে সত্য পরিচয় দিয়াছে, তাহার নাম ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজ নহে, তাহার নাম মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। বালিকাদের পিতা তাহার জ্ঞাতি। পূর্ব্বপরিচয় শুনিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, তাহারা কাশ্যপ-গোত্র, আপনারাও কাশ্যপগোত্রীয়, সুতরাং বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে পারিবে না। এখন আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে, এখন বুঝিয়াছি, তাহাদের শাণ্ডিল্য গোত্র।"

আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বড়বাবু কহিলেন, "তবে আমি মেয়ে দুইটী আমাদের নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখিব। এ বৎসর আমি কাছারীতে আসিতাম না, আপনি আসিয়াছেন, ছোটবাবুর পত্রে এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া আমাকে আসিতে হইয়াছিল, কার্য্য শেষ হইয়াছে, আমি অধিক দিন এখানে থাকিব না, একটী শুভদিন দেখিয়া আমি বাড়ীতে যাত্রা করিব, মেয়ে দুটীকেও সঙ্গে লইয়া যাইব। বিচার শেষ হইয়া গেলে আপনি দয়া করিয়া আমাদের বাড়ীতে যাইবেন, সেইখানেই সকল কথা হইবে। কন্যাদের পিতার নাম-ঠিকানা আপনি পাইয়াছেন, সেই ঠিকানায় তাঁহাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইবেন। তিনি যদি আমার বাড়ীতে আসিতে ইচ্ছা করেন—"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "পত্র লিখিয়া অভিপ্রায় জানিবার সুবিধা হইবে না, আমি স্বয়ং হুগলী জেলায় গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিব; শুভ-সংবাদ দিব, অবশ্য তিনি আমার সঙ্গে আসিবেন।

আমি শুনিয়াছি তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এখন মন্দ হইয়াছে, আপনার সহিত কুটুম্বিতা হইলে তিনি সুখী হইতে পারিবেন, এই বলিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে আমি আনিতে পারিব।”

বড়বাবু কহিলেন, “বাধিত হইলাম, আপনি আমার পরম বন্ধু। আমার উপকারের জন্য আপনি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন, বিস্তর কষ্ট পাইয়াছেন, আরও কষ্ট স্বীকার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিব না।”

নমস্কার করিয়া গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, “আপনি আমাকে বেশী কথা বলিতেছেন; অত উচ্চ সাধুবাদ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য-পাত্র আমি নই। আপনারা উভয় সহোদরে আমার প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার দেখাইতেছেন, তাহাতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি। আমার স্বদেশে যৎকিঞ্চিৎ বিষয় আছে, তাহাতেই সংসার চলে। আমি কখনও কাহার চাকরী করি না। কোম্পানীর প্রজা আমি বটে, কিন্তু কোম্পানীর চাকর নই। দেশে চোর-ডাকাতের বড় উপদ্রব, কোম্পানীর পুলিস সর্ব্বদা চোর-ডাকাত ধরিতে পারে না, বদ্‌মাসলোকেরা পশ্রয় পায়। কেন ধরা পড়ে না, তাহাই আমি ভাবিতাম। লোকের মুখে শুনিতাম, বরিশালে দুর্দ্দান্ত বদ্‌মাস লোক অধিক। বরিশাল দেখিবার জন্য আমি বাহির হইয়াছিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম, প্রতিবৎসর আপনাদের কাছারীতে ডাকাতী হয়, এক বৎসরও ধরা পড়ে না। গত বৎসর ছদ্মবেশে-আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, এ বৎসর প্রকাশ্যরূপে প্রকাশ্য কার্য্য করিলাম, পরিশ্রম সার্থক হইল। এখন আমার আর একটী নিবেদন। আমার সঙ্গে যে একটী বালক আছে, তাহাকে আপনি দেখিয়াছেন, সেই বালকটী

আমার পুত্র। তাহার নাম কিংশুক। বালিকা দুটীকে আপনি নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, সেই সঙ্গে আমার কিংশুকটীকেও লইয়া গেলে আমি উপকৃত হইব। কেন না, তাহার গর্ভধারিণী নাই, অবোধ শিশু আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। আমার এখনও অনেক কার্য্য বাকী, কোথায় কখন্ থাকিব, স্থির নাই। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বালকটীকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এই আমার অনুরোধ।"

আহ্লাদ পূর্ব্বক মহানন্দবাবু সম্মত হইলেন। পঞ্জিকা দেখিয়া শুভদিন স্থির করা হইল। তিন দিন পরে সরোজিনী, বিনোদিনী, কিংশুক, দুইজন চাকর আর চারিজন দরোয়ানকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দবাবু নিজ বাটীতে যাত্রা করিলেন। দুইখানি শিবিকা। একখানিতে বাবু, দ্বিতীয়খানিতে দুটী বালিকা আর কিংশুক। যাত্রাকালে শিবিকার নিকটে উপস্থিত হইয়া মুস্তফী একবার মনিবের মুখের দিকে, একবার কিংশুকের মুখের দিকে, একবার বালিকা দুটীর মুখের দিকে ঘন ঘন চাহিল, ঘন ঘন লাঙ্গুল সঞ্চালন করিল। পাল্কী যখন চলিল, মুস্তফীর চক্ষে তখন জল পড়িল। তাহার যেন ইচ্ছা ছিল, পাল্কীর সঙ্গে যায়, কিন্তু গোপেশ্বরবাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পায়ের কাছে আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া সে তাহার মুখের দিকে চাহিল, গোপেশ্বরবাবু তাহার মস্তকে হাত বুলাইলেন, দুই একটা সঙ্কেতকথা বলিলেন, মাথা নীচু করিয়া মুস্তফী স্থির হইয়া রহিল।

দ্বাদশ কাণ্ড।

ফাল্গুনমাস শেষ হইয়া আসিল। বরিশালের ফৌজদারী আদালতে ডাকাতী মকদ্দমা। পুলিসের রিপোর্ট-প্রমাণে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষিগণের জবানবন্দী গ্রহণ করিলেন, আসামীদের জবাব লইলেন, বেশী আড়ম্বর কিছুই হইল না, হইবার আবশ্যকও ছিল না। আদালত লোকারণ্য; হাতকড়ী-বেড়ী-পরা এত আসামী কোন মকদ্দমায় একসঙ্গে দাঁড়ায় না। অভূতপূর্ব্ব ভয়ানক দৃশ্য। ইতিপূর্ব্বে কত জায়গায় ডাকাতী করিয়াছে, তাহাদের দলে আরও লোক আছে কি না, মাজিষ্ট্রেট সাহেব বন্দিগণকে সেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা উত্তর দিল না। চোর-ডাকাতেরা একটা ধর্ম্ম মানে, সঙ্গী লোকের সংখ্যা অথবা নাম কিছুতেই প্রকাশ করিতে চাহে না। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন, ঘটনা-ক্ষেত্রে যাহারা বমাল গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী-সাবুদ প্রয়োজন করে না; বিনা সন্দেহে অপরাধ সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। অতএব চূড়ান্ত বিচারের নিমিত্ত মকদ্দমা দায়রা-সোপর্দ্দ করিবার আদেশ হইল।

গোপেশ্বরবাবু আদালতে উপস্থিত ছিলেন, একজন উকীলের দ্বারা তিনি বলাইলেন, "মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্ঞী-পক্ষের সাক্ষীরূপে গণ্য হইয়াছে, আইনানুসারে সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইতে পারে।"

মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "ডাকাত ধরা পড়িবার অগ্রে সে যদি ঐ

সকল কথা বলিত, সন্ধান বলিয়া দিয়া ধরাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে আইনের আশ্রয় পাইত, এ ক্ষেত্রে সকলে যখন একসঙ্গে ধরা পড়িয়াছে, তখন মুরলীধর কোন কথা না বলিলেও অপরাধ সাব্যস্ত হইতে বাকী থাকিত না। তবে ঐ দলে আরও ডাকাত আছে কি না, যদি থাকে, কোথায় আছে, তাহাদের নাম কি, কোথায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে, মুরলীধর যদি সে সব কথা বলে, তাহা হইলে আইনের মর্ম্ম পালন করা যায়।" মুরলীধর সে সব কথা বলিল না কিম্বা বলিতে পারিল না, অতএব আইনের আশ্রয় পাইল না; অবশিষ্ট বন্দিগণের সঙ্গে সে ব্যক্তিও সেসনে অর্পিত হইল। সেই সময় মুরলীধর একবার গোপেশ্বরের দিকে কটাক্ষপাত করিল। গোপেশ্বরবাবু মাথা হেঁট করিলেন। আসামীরা হাজতে গেল। কুড়িজন মল্ল বিদায় প্রাপ্ত হইল।

চব্বিশ দিন পরে সেসনের বিচার। নথীর আদ্যোপান্ত পাঠ শ্রবণ করিয়া জজ সাহেব আসামীগণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। সরকারী উকীল সেই সময় মুরলীধরের কথা তুলিলেন। জজ সাহেব বলিলেন, "অবস্থাগতিকে মুরলীধর ক্ষমা পাইতে পারে না, তবে উহার পক্ষে এই পর্য্যন্ত অনুগ্রহ হইতে পারে, এখানকার কারাগারে সাত বৎসর কয়েদ থাকুক্।" সেই কুড়িজন মল্লও সেসন-আদালতে সাক্ষীমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, ডাকাতদলের সঙ্গে তাহারা ধরা পড়ে নাই; পূর্ব্বে পূর্ব্বে দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া ডাকাতী করিত, সে কথাও প্রকাশ হইল না, অতএব তাহারা বিনা দণ্ডে বাঁচিয়া গেল।

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

চৈত্রমাসের শেষ। বরিশালের কাছারীতে গাঁজনের উৎসব। চারিদিকে ঢাক বাজিয়া উঠিল, শত শত সন্ন্যাসী জড় হইতে লাগিল, শিবপূজা আরম্ভ হইল। সংক্রান্তি নিকট। ২৮ শে তারিখে সন্ন্যাস;—ফুলঝাঁপ, মালঝাঁপ, বটীঝাঁপ। ২৯ শে তারিখে বাণ-ফোড়া। ৩০ শে তারিখে চড়কপূজা। সন্ন্যাসীরা চড়কগাছে ঘুরিল, বাঙ্গালীর বৎসরটীও ঘুরিল। ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে বৎসরটী বিদায় হইয়া গেল। নূতন বৎসরের প্রথম-মাসের প্রথম-দিবসে সংযাত্রা ও গোষ্ঠযাত্রা। সেই দিন সন্ধ্যার পর জমিদারী কাছারীতে প্রায় একশত সন্ন্যাসী পরিতোষরূপে চিড়ে, দধি ও সন্দেশ আহার করিল। উৎসব ফুরাইয়া গেল, সকলে কাজকর্ম্ম করিবার অবসর পাইলেন। ডাকাতেরা যে সকল টাকার বস্তা মাথায় করিয়া অগ্রে থানায়, তাহার পর আদালতে লইয়া গিয়াছিল, সেই সকল টাকা হাকিমের হুকুমে কালেক্টারী কাছারীতে আমানত জমা রাখা হইয়াছিল,দারোগাকে সঙ্গে করিয়া সদানন্দবাবু কাছারীতে গিয়া, দস্তুরমত রসীদ দিয়া সেই সকল টাকা তুলিয়া আনিলেন। আমলারা, চাপরাসীরা, পিয়াদারা কিছু কিছু বক্‌সীস পাইল।

এই কার্য্যের পর আর একটী বড় কার্য্য। যে সকল প্রজার ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল,জমিদার সরকারের খরচে সেই সকল প্রজার নূতন নূতন ঘর বাঁধাইয়া দিবার বন্দোবস্ত হইল। অনেক লোক কাজে লাগিল। ঘরামী, দেয়ালী, ছুতোর-

মিস্ত্রী ও মজুরের সংখ্যা দুইশত। অল্পদিনের মধ্যেই ঘরগুলি প্রস্তুত হইল। প্রজারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে আপনাদের কুটুম্ববাটীতে আশ্রয় লইয়াছিল, ঘর প্রস্তুত হইলে পরিবার, গরু-বাছুর ও জিনিসপত্র লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল; তাহাদের ধান্য-তৃণাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য অধিকারের মধ্যে অপরাপর স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কাহার কত ধান্য, তাহার একখানা ফর্দ্দ করিয়া কাছারীর ঝারা মহাশয় আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন, প্রজা-লোকজন নূতন ঘরে বাস করিবার পর সেই সকল ধান্য যাহার যত ফর্দ্দ দেখিয়া মাপ করাইয়া তাহাদের সকলকে দেওয়া হইল, বিচালি-গুলিও প্রজারা বুঝিয়া পাইল। সদানন্দবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রতি বৎসর বৈশাখমাসের প্রথমে জমিদার মহাশয়েরা বাটী চলিয়া যান, এ বৎসর ঐ সকল কর্ত্তব্যকার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অনেক বিলম্ব হইল, বৈশাখমাসের ২৫ শে তারিখে সদানন্দবাবু আপন লোকজন সমভিব্যাহারে বাটীতে যাত্রা করি-লেন, কালেক্টারী হইতে যে সকল টাকা আসিয়াছিল, সেই সকল টাকা এবং ২৪ শে বৈশাখ পর্য্যন্ত খরচ-পত্র বাদে কাছারীতে যত টাকা মজুত হইয়াছিল, সদানন্দবাবু সেইগুলি সঙ্গে লইয়া গেলেন. থানার দারোগা আসল কার্য্য কিছুই করেন নাই, তথাপি তিনি পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাইলেন।

বলা উচিত, গোপেশ্বরবাবু কিছু পূর্ব্বে মুস্তফীকে সঙ্গে লইয়া কাছারী হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কোথায় গিয়াছেন, কাছারীর কাহাকেও তাহা বলিয়া যান নাই, আবার তিনি আসি-বেন, এ কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোথায় আসিবেন, সে কথা বলেন নাই।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড

বাখরগঞ্জ জেলার একখানি গণ্ডগ্রামে মহাপাত্র মহাশয়-দিগের ভদ্রাসনবাটী। তাঁহারা সেখানকার বড় জমিদার। বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয়। বাটীখানি প্রাচীনকেতায় নির্ম্মিত, কিন্তু অত্যন্ত বৃহৎ, লোকজনও অনেক। সদর-বাড়ীর বাহিরে দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, বৃহৎ রক, দ্বাদশ শিবমন্দির আর একখানা প্রশস্ত অট্টালিকা;—তাহাতে বাঙ্গালা পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, কবি-রাজী চিকিৎসালয় আর অতিথিশালা। পূর্ব্বে আভাষ দেওয়া আছে. বাবুদিগের বংশের আদি উপাধি চট্টোপাধ্যায়; মহানন্দ-বাবুর একজন পূর্ব্বপুরুষ রাজ-সরকারে বড় একটা চাকরী করি-তেন, সেই চাকরীর খেতাব হইয়াছিল "মহাপাত্র", তদবধি সেই বংশের সকলেই মহাপাত্র বলিয়া বিখ্যাত। প্রাচীন কর্ত্তারা পরলোকযাত্রা করিয়াছেন, মহানন্দবাবুই এখন কর্ত্তা। তাঁহার দুইটী পুত্র;—একটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর একটী নাবালক। সদানন্দবাবু মহানন্দবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর, তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাঁহাদের একজন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা আছে; ইহা ব্যতীত নিকট-সম্পর্কীয়, দূর-সম্পর্কীয়, নিঃসম্পর্কীয় অনেক লোক সেই বাড়ীতে থাকেন, কেহ কেহ কাজকর্ম্ম করেন, কেহ কেহ কিছুই করেন না, অথচ সকলেই বাবু নামে পরিচিত। এদেশের অনেক বড়মানুষের বাড়ীতে এইরূপ পোষ্য, অপোষ্য, কুপোষ্য অনেক থাকে। পূর্ব্বে আরও বেশী ছিল, ইংরাজী লেখাপড়ার চর্চ্চায় অনেক কমিয়া

আসিয়াছে। জামাইবাবু, ভাগ্নেবাবু, সম্বন্ধীবাবু পরিবারের মধ্যেই গণ্য।

বাড়ীতে স্ত্রীলোক অনেকগুলি। মহানন্দবাবুর পাঁচটী ভগ্নী; দুটী সধবা, তিনটী বিধবা। মহানন্দবাবুর স্ত্রী গৃহিণী হইলেও গৃহিণীপনা তাঁহার হস্তে নাই। মহানন্দবাবুর মাতা বর্ত্তমান। বাড়ীতে একটী সুখের বিষয় এই যে, কেহ কাহারও অবাধ্য নহে। গৃহিণী যাহা করেন, যাহা বলেন, কেহই তাহাতে কোন কথা কহেন না। মহানন্দবাবুর কর্ত্তৃত্বাধীনেই গৃহকার্য্য চলে। ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ।

দাসদাসী দরোয়ান অনেক; আমলাও প্রায় বিশ পঁচিশ জন। খরচ-পত্র বিস্তর। ধনবান্ হিন্দুসংসারে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, এই একটা প্রসিদ্ধ কথা আছে। মহানন্দবাবুর সংসারে তেরো পার্ব্বণ অপেক্ষাও বেশী পার্ব্বণ হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা এই চারি পার্ব্বণেই বেশী সমারোহ হয়।

সকলেই বলে, মহানন্দবাবুর সংসার বড় সুখের সংসার। এখনকার দিনে সেরূপ সুখের সংসার প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, এই একটা কথা বহুদিবসাবধি চলিত ছিল বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমাণে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে, কার্য্যক্ষেত্রে সে কথাটা আজকাল অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। মহানন্দবাবুর সংসার সে প্রবাদ-পরিবর্জ্জিত।

এই সংসারে নূতন আসিয়া রহিয়াছে সরোজিনী, বিনোদিনী আর কিংশুক। গোপেশ্বরবাবু কোথায় গেলেন, কোথায় রহিলেন, তাহা না জানিয়া, জানিতে না পারিয়া, তাহারা কতই ভাবে,

বিরলে থাকিলে চক্ষের জল ফেলে। সরোজিনী আর বিনোদিনী তাঁহাকে মাতা বলিয়া জানে, গোপেশ্বর বলিয়া জানে না; তাহারা জানে, তাঁহার নাম সুরধুনী দেবী; তাহারা তাঁহার পুরুষবেশ দর্শন করে নাই; কিন্তু কিংশুক জানে, গোপেশ্বর তাঁহার পিতা। বালক যদিও নিজ পিতার পুরুষবেশ নারীবেশ উভয়ই দেখিয়াছে, কিন্তু শিক্ষার গুণে সর্ব্বদা সাবধান। সুরধুনী দেবী পুরুষ, কিংশুক ঐ ভগিনী দুটীকে সে কথা একদিনও বলে নাই। না বলিলে কি হয়, প্রায় তিন মাসকাল গোপেশ্বরবাবুকে না দেখিয়া তাহারা তিন জনেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছে; খাইয়া সুখ পায় না, শুইয়া সুখ পায় না, গল্প করিয়া সুখ পায় না, খেলা করিয়া সুখ পায় না, সর্ব্বদা মনের অসুখ, মুখ সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ণ; বাবুর বাড়ীর পরিবারেরা তাহাদের মুখে একদিনও একটু হাসি দেখেন নাই।

ফাল্গুনমাসে তাহারা আসিয়াছে, চৈত্রমাস চলিয়া গিয়াছে, বৈশাখমাস প্রায় যায়। সদানন্দবাবু আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে গোপেশ্বরবাবু আসিলেন না। বালক-বালিকাদের আরও ভাবনা বাড়িল।

জ্যৈষ্ঠমাস আগত। সদানন্দবাবু তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছিলেন, জ্যৈষ্ঠমাসে তোমাদের মাতা আসিবেন। দিন দিন জ্যৈষ্ঠমাস ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। চারিমাসেই তাহারা রোগা হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠমাসে বিশেষ কোন পার্ব্বণ ছিল না। বালক-বালিকা তিনটীকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য মহানন্দবাবু নিজ বাটীতে রামায়ণ-গান দিয়াছিলেন। নিত্য বৈকালে লাল পোষাক পরিয়া, লাল পাগড়ী মাথায় দিয়া, চামর-মন্দিরা লইয়া

আটজন লোক রামায়ণ-গান করিত; নূপুর পায় দিয়া লাফা-ইয়া লাফাইয়া নাচিত, সকলে তাহা দেখিয়া হাসিতেন. ঐ তিনটী বালক-বালিকাও ক্ষণেকের জন্যে একটু একটু হাসিত, সন্ধ্যাকালে আবার গান ভাঙ্গিয়া গেলে মুখ ভারী করিয়া একধারে বসিয়া থাকিত, হাসির নাচ, হাসির কথা আর তাহাদের মনে থাকিত না। সংক্রান্তির দিন রামায়ণগান ফুরাইল।

আষাঢ়মাস আরম্ভ। আষাঢ়মাসে রথযাত্রা। বাবুদের বাড়ীতে রথযাত্রার সময় খুব ঘটা হয়। দিন থাকিতে থাকিতে রথের আয়োজন হইতে লাগিল। খণ্ড খণ্ড খড়ের চাল দিয়া রথখানি ঢাকা ছিল, চালগুলা খুলিয়া ফেলিয়া রথখানি নূতন রং করা আরম্ভ হইল, ফটকে নহবৎ বসিল, বাড়ীর সম্মুখে হাট-বাজার বসিল। রথের চূড়ায় বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা তুলিয়া দেওয়া হইল। কাষ্ঠের ঘোড়ারা নূতন রং মাখিয়া, নূতন সাজ পরিয়া যেন সজীব হইয়া উঠিল। রথের কাষ্ঠের সারথি সাদা চাপকান পরিয়া, সাদা পাগড়ী মাথায় দিয়া, ঘোড়াদের লাগাম ধরিয়া, চাবুক হাতে করিয়া দাঁড়াইল। চমৎকার শোভা!

রথের আর আটদিন বাকী। নিত্য নিত্য হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল, বাড়ীর দাসী-চাকরের সঙ্গে সরোজিনী, বিনোদিনী, কিংশুক এক একবার বাহির হয়; রথের সজ্জা দেখে, সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করে, কিন্তু মনে সুখ পায় না। রথের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। জগন্নাথের রথ, রথের ঠাকুরের নাম জগন্নাথ, বালিকারা এই কথা শুনিল। ডাকাতেরা যখন তাহাদিগকে হরণ করে, তখন তাহাদের বয়স অতি অল্প ছিল. সে বয়সে কি কি ঠাকুর তাহারা দেখিয়াছিল, তাহা তাহাদের ঠিক মনে

ছিল না, মনে ছিল কেবল মা দুর্গা, মা কালী, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী, এই সব কথা বলিতে হয়, সমস্ত ঠাকুরকেই মা বলিয়া প্রণাম করিতে হয়, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল। বাবুদের রথ যখন টানা হয়, সেই সময় যখন সকলে করতালি দিয়া 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া আনন্দধ্বনি করে, সরোজিনী সেই সময় তফাতে দাঁড়াইয়া করযোড় করিয়া বর চাহিয়াছিল, "হে মা জগন্নাথ! আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর, মাকে এনে দাও।"

জগন্নাথদেব রথে বসিয়া বালিকা সরোজিনীর কথা শুনিলেন, সেই দিন বৈকালে গোপেশ্বরবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে একজন অর্দ্ধবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর সেই প্রভুভক্ত মুস্তফী। বৈঠকখানায় উঠিয়া বাবুদের মুখে গোপেশ্বর শুনিলেন, মেয়ে দুটী আর শিশুটী তাঁহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। গোপেশ্বরবাবু তাহাদিগকে দেখা দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু ভাবিলেন,এ বেশে সরোজিনী বিনোদিনী তাঁহাকে চিনিবে না, নারীবেশে দেখা দিতে হইবে। সদানন্দবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নারীবেশ-ধারণের প্রত্যালঙ্কার সংগ্রহ করিলেন, একজন দাসীকে ডাকাইয়া বলিয়া দেওয়া হইল, বড়বাবুর সঙ্গে যে দুটী বালিকা আর বালকটী আসিয়াছে, পূজার দালানের পাশের ঘরে তাহাদিগকে আনিয়া বসাও। বালিকা দুটীকে বলিও, তোমাদের মা আসিয়াছেন।

দাসী তাহাই করিল। পূজার দালানের পাশের ঘরে সে তিনটীকে আনিয়া রাখিল। একটু পরে সুরধুনী-বেশে গোঁপেশ্বরবাবু সেই ঘরে গিয়া দর্শন দিলেন। তাঁহার গোঁপ-দাড়ী ছিল না, যখনই ইচ্ছা, তখনই নারীবেশ-ধারণের সুবিধা হইত।

সুরধুনীকে দেখিয়া বালিকাদের আহলাদের সীমা রহিল না—তাহাদের সকল ভাবনা দূর হইল। সুরধুনীর মুখপানে চাহিয়া কিংশুকটী মৃদু মৃদু হাসিল; বালিকারা সেই সময় কত কথাই কহিল, কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল; সুরধুনী সকল কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।

আহলাদে বালিকাদের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, আহলাদে করপুটে সরোজিনী তখন তাহার মা জগন্নাথকে উদ্দেশে বার বার নমস্কার করিতে লাগিল।

সুরধুনী কহিলেন, "তোমরা তবে বাটীর ভিতর যাও, আমার কতকগুলি কার্য্য আছে, শীঘ্র শীঘ্র সেইগুলি সমাধা করিতে হইবে।"

এই বলিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে ছদ্মবেশী গোপেশ্বর-বাবু সে ঘর হইতে বাহির হইলেন, বালিকাদের অদেখা হইয়া উপরের বৈঠকখানায় উঠিয়া গেলেন, সেখানে নারীবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজবেশ ধরিলেন, বাবুদের সহিত তাঁহার অনেক প্রকারের অনেক কথা হইল, বাবুরা সন্তুষ্ট হইলেন।

যে ব্রাহ্মণটী গোপেশ্বরবাবুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের কিছু অধিক, খর্ব্বাকার, স্থূল দেহ, মাথায় ছোট ছোট চুল, কাণের উপর দিয়া চক্রাকারে ক্ষৌরী করা, মস্তকের মধ্যস্থলে অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত একটী টিকী। এই টিকীর অগ্রভাগে গ্রন্থিবদ্ধ। সচরাচর আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণগণের যেরূপ চুল হয়, যে প্রকারে ক্ষৌরী করা হয়, যে প্রকার টিকী থাকে, এই ব্রাহ্মণটীরও সেইরূপ। বর্ণ গৌর, মুখ-খানি ঈষৎ গোল, নাসিকা সরল, চক্ষু দুটী ছোট ছোট, কপাল

প্রশস্ত, গোঁপ-দাড়ী কামানো, অল্প অল্প ভুঁড়ি আছে। বুকে অনেক চুল, নাম লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দশকর্ম্মান্বিত ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, দেশে অনেকগুলি যজমান আছে, তাহাদের বাড়ীতে যজন-যাজন ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া লোকনাথ কষ্টে-সৃষ্টে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে লোকনাথ ভট্টাচার্য্য বলিয়া সম্মানদান করিয়া থাকেন।

মহাপাত্র বাবুরা লোকনাথের এই পর্য্যন্ত পরিচয় পাইয়া সমাদরে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে বাটীতে রাখিলেন, রথের আমোদ চলিতে লাগিল, প্রথম দিনের উৎসব শেষ। অষ্টাহে অষ্টমঙ্গলা। দিনমানে ব্রাহ্মণভোজন, কাঙালীবিদায়, বাজেলোকের ভিড়; বৈকালে জগন্নাথ-মন্দিরে গীত, রাত্রিকালে কোনদিন যাত্রা, কোনদিন ওস্তাদী কবি, কোনদিন পাঁচালী। নবম দিবসে জগন্নাথ-দেবের পুনর্যাত্রা। সেই দিন মহা সমারোহ হইল। সহস্র সহস্র লোক বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়া বাবু-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

রথের আমোদ ফুরাইল। অবকাশপ্রাপ্ত হইয়া মহানন্দ-বাবু একদিন লোকনাথের বিশেষ পরিচয় জানিতে উৎসুক হইলেন। সন্ধ্যার পর একটী গৃহে মহানন্দ, সদানন্দ, গোপেশ্বর ও লোকনাথ; চৌকাঠের কাছে পাপোশের উপর মুস্তফী। গোপে-শ্বরবাবু কহিলেন, "যে সকল ডাকাত ধরা পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ, তাহারা এই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞাতি, একগ্রামে নিবাস। গ্রামখানি হুগলী জেলার অন্তর্গত; গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গঙ্গার সেই স্থান ত্রিবেণী নামে বিখ্যাত। সেই

পাঁচজন ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে ডাকাতী করিয়া বাবু হইয়াছিল। এই লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের জ্ঞাতি হইলেও ইঁহার বিষয়-আশয় ছিল না, এখনও নাই। ইঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, ইনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত; ভট্টাচার্য্যের কার্য্য করিয়া দিন গুজরান্ করেন। ইঁহার একটী পুত্র আর দুইটী কন্যা, পুত্রের নাম শিবনাথ ভট্টাচার্য্য। শিবনাথ বাল্যকালাবধি মাতাপিতার অবাধ্য ছিল, লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই, পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গ্রামের একজন মিত্র কায়স্থের সহিত পশ্চিমদেশে চলিয়া যায়, সেই মিত্র মহাশয় কোম্পানীর যুদ্ধ-বিভাগে কমিসারিয়েটে চাকরী করিতেন, শিবনাথকে বাজার-সরকারী চাকরী দিবেন বলিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু শিবনাথ তাঁহার কাছে থাকিতে পারে নাই; মাসখানেক থাকিয়া পলায়ন করিয়াছিল, কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান হয় নাই; তাহার পলায়নের পর লোকনাথের দুইটী কন্যা জন্মে, কন্যা দুটী যখন ছোট, সেই সময় একদিন তাহারা হারাইয়া যায়, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া অস্থির হন, পুত্রের নিরুদ্দেশে আর কন্যা দুটীর শোকে অত্যন্ত কাতরা হইয়া উৎকট পীড়ায় ব্রাহ্মণী শয্যাগত হইয়াছিলেন, কন্যা হারাইবার দুই মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। স্ত্রী-পুত্র ও কন্যা-হারা হইয়া এই ব্রাহ্মণ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন। বাড়ীতে ইঁহার এক বিধবা ভগ্নী আর সেই ভগ্নীর দুটী পুত্র আছে, তাহাদিগকে লইয়াই ইনি সংসার করিতেছিলেন। প্রায় আট নয় বৎসর সেই ভাবে চলিতেছিল। একজন ডাকাতের মুখে সন্ধান পাইয়া আমি ইঁহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।"

দুঃখঃ প্রকাশ করিয়া মহানন্দবাবু বলিলেন, "পুত্রটী নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহার কোন সন্ধান হয় নাই, মেয়ে দুটী হারাইয়া গিয়াছে, তাহাদেরও কি উদ্দেশ হইল না?"

ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "হইল কি না হইল, হইয়াছে কি না হইয়াছে, ইঁহাকে আমি কোন কথা বলি নাই; অন্য কথা বলিয়া ভাল করিবার আশ্বাস দিয়া ইঁহাকে আমি এখানে আনিয়াছি। আপনি বোধ হয় স্মরণ করিতে পারিবেন, দৈবঘটনাক্রমে একবার আমি দিনাজপুরে গিয়াছিলাম, সে কথা আমি আপনাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেখানকার মহীপাল-কাননের পঞ্চানন দেবের মন্দিরতলে সুড়ঙ্গপথে পাথরের বাড়ীতে ডাকাত ছিল। সেই সকল ডাকাতের আড্ডায় দুটী বালিকাকে আমি দেখি; দয়াবশে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া এই জেলার জগৎ-পুরগ্রামে আমার একজন বন্ধুর বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়া-ছিলাম; তাহার পর আপনাদের কাছারীবাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখি। সেখানে যাহা যাহা হইয়া গিয়াছে, আপনি জানেন। কাছারী হইতে বাড়ী আসিবার সময় আপনি তাহাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছেন, সেই দুটী কন্যা—সরোজিনী আর বিনোদিনী, এই লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দুটী কন্যার পিতা।"

লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন;—"কোথায় আমার কন্যা, কোথায় আমার কন্যা, কোথায় আমার সরোজিনী, কোথায় আমার বিনোদিনী? আপনি আমার ধর্ম্ম-বাপ, আপনি সেই দুটীকে আনিয়া আমাকে দেখান; তাহাদিগকে

হারাইয়া আমি জীয়ন্তে মরা হইয়া আছি ;—দেখান, দেখান, দেখান, ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করুন !"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "আপনি শান্ত হউন, আর উদ্বেগ নিষ্কারণ,—তাহারা কুশলে আছে, তাহারা নিরাপদে আছে, আমি তাহাদের আপন কন্যার ন্যায় যত্নে রক্ষা করিয়াছি ; নারীবেশ ধারণ করিয়া, মা বলিয়া পরিচয় দিয়া আমি তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়াছি। এইখানেই আপনি আপনার হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।"

লোকনাথ কহিলেন, "জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ! আপনি তাহাদিগকে এখানে আনিয়া একবার আমাকে দেখান। তাহারা আমার কাছে আসুক, বহুদিন পরে তাহাদের মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হই।"

মহানন্দবাবু চমৎকৃত হইলেন, তাঁহাদের বদনে আনন্দ ও বিস্ময় একসঙ্গে অঙ্কিত হইল, গোপেশ্বরবাবুর মুখপানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বন্ধুরূপে আপনাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ; দেখিতেছি, আপনি অসাধ্যসাধন করিতে পারেন ! পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আপনার ঋণ-পরিশোধনে আমি অক্ষম।"

গোপেশ্বরবাবুকে এই কথা বলিয়া শশব্যস্তে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। চক্ষের জল মুছিয়া লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপেশ্বরবাবুর দুখানি হাত ধরিলেন, অবরুদ্ধস্বরে বলিলেন, "বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথার্থ, যথার্থই আপনি অসাধ্যসাধন করিতে পারেন ! কস্মিনকালেও আপনার সহিত আমার জানা-শুনা ছিল না, তথাপি আপনি অযাচিত হইয়া আমার

মহোপকার করিয়াছেন! প্রাণ দিয়াও আপনার প্রত্যুপকার করিতে আমি প্রস্তুত।"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা আমি রাখি না। আমার কর্ত্তব্যকার্য্য আমি আপন ইচ্ছায় পালন করি। আপনি হারানিধি প্রাপ্ত হইলেন, ইহাই আমার যথেষ্ট প্রত্যুপকার।"

মহানন্দবাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, দ্বার-দেশে পাপোশের উপর মুস্তফী। বাহির হইবার পথ অবরুদ্ধ। মুস্তফী নড়িল না। সতর্ক-দৃষ্টিতে বাবুর মুখ-পানে চাহিয়া লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিল।

গোপেশ্বরবাবু শীস দিলেন, মুস্তফী তখন আহ্লাদে মুখ ঘুরা-ইতে ঘুরাইতে কর্ণ-লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে জাজিমের উপর ছুটিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। মহানন্দবাবু হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন।

সদানন্দবাবু, গোপেশ্বর আর লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহ-মধ্যে বসিয়া প্রাসঙ্গিক কথোপকথনে অন্যমনস্ক ছিলেন, মুস্তফী আসিয়া গোপেশ্বরবাবুর কোলের কাছে বসিল। সাদরে গোপে-শ্বরবাবু তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বৈঠকখানার পূর্ব্বদিকের একটা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দ্বার-সমীপে মহানন্দবাবু। হস্ত-সঙ্কেতে তিনি গোপেশ্বরবাবুকে ডাকিলেন, গোপেশ্বরবাবু নিকটস্থ হইলেন, উভয়ে চুপি চুপি কি কথা হইল। মহানন্দবাবু সরিয়া গেলেন। গোপেশ্বরবাবু ফিরিয়া আসিয়া লোকনাথকে সঙ্গে করিয়া পার্শ্বস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দিব্য একটী প্রশস্ত কক্ষ। দেয়ালের চারিধারে ডবল-ব্র্যাঞ্চ দেয়ালগিরির নীচে নীচে সুচিত্রিত দশমহাবিদ্যা ও নারায়ণের দশাবতারের ছবি। ঘরের একধারে উচ্চ-মঞ্চের উপর সারি সারি আট দশটী পাথরের পুতুল। তাহাদের কোলে কোলে বিচিত্র-বর্ণের পুষ্পাধার। গৃহতলে গালিচা পাতা, তাহার উপর মৃগ-চর্ম্মাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি উপাধান। একটী উপাধান-গাত্রে ঠেস দিয়া দুটী বালিকা প্রায় জড়াজড়ি করিয়া বসিয়া আছে। পার্শ্বে একজন অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা পরিচারিকা। মহানন্দবাবু সে ঘরে নাই। লোকনাথকে লইয়া গোপেশ্বরবাবু বালিকাদের দুই হাত তফাতে গিয়া বসিলেন। বালিকারা একবার ঊর্দ্ধনেত্রে গোপে-শ্বরবাবুর মুখপানে চাহিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিল; চিনিতে পারিল না, যেন কেমন ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হইয়া উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। হাসিয়া তাহাদের হস্তধারণ করিয়া গোপেশ্বরবাবু বলিলেন, "ইঁহাকে প্রণাম কর; ছোটবেলা দেখিয়াছ, মনে নাই, ইঁনি তোমাদের পিতা।"

বালিকারা উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, উঠিল না, বক্র-গ্রীবায় মুখ ফিরাইয়া ফ্যাল-ফ্যাল-চক্ষে লোকনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল। গোপেশ্বরবাবু পুনরায় বলিলেন, "প্রণাম কর, ইঁনি তোমাদের পিতা।"

বালিকারা বসিয়া বসিয়া পিতৃ-চরণে প্রণাম করিল। লোক-নাথের চক্ষে দরদর অশ্রুধারা। বালিকাদের চক্ষু বিশুষ্ক। সস্নেহ-বচনে লোকনাথ বলিলেন, "মা সরোজিনি! মা বিনোদিনি! তোমরা আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, না পারিবারই কথা, যখন তোমরা হারাইয়া গিয়াছিলে, তখন তোমাদের জ্ঞান হয়

নাই, অজ্ঞানের কথা ৮।৯ বৎসর মনে থাকিতে পারে না। আমি তোমাদের অভাগা পিতা। তোমাদের দুটীকে হারাইয়া অন্ধকার সংসারে আমি মরার মতন হইয়া ছিলাম। তোমাদের কৃষ্ণ-রাধিকা, তোমাদের জগন্নাথ, তোমাদের খেলিবার পুতুলের বাক্স, পুতুলের পাল্কী আমার সেই অন্ধকার ঘরে পড়িয়া আছে, সেই-গুলি যখন দেখিতাম,তখন হু হু করিয়া আমার চক্ষে জল পড়িত। এসো মা! আমার কোলে এসো!" এই বলিয়া কন্যা দুটীকে কোলে লইবার জন্য তিনি বাহু-প্রসারণ করিলেন। বিনোদিনী তাঁহার দিকে চাহিতে না পারিয়া সরোজিনীকে জড়াইয়া ধরিল। দুটীর একটীও পিতার কোলে যাইতে পারিল না।

সাশ্রুনয়নে লোকনাথ বলিলেন, "সত্যই আমি অভাগা! আমাকে দেখিয়া তোমরা ভয় পাইতেছ।" এই বলিয়া গোপে-শ্বরের দিকে চাহিয়া তিনি আবার বলিলেন, "এই দয়াময় ভদ্র-সন্তানের অনুগ্রহে আবার আমি তোমাদের দেখিতে পাইলাম, বাঁচিয়া ছিলাম, সেই জন্যই দেখিলাম। তোমাদের গর্ভ-ধারিণী—"

পাছে তাঁহার সেই নির্ঘাতবাক্য লোকনাথের মুখে হঠাৎ নির্গত হয়, সেই শঙ্কায় গোপেশ্বরবাবু তাঁহাব কথায় বাধা দিয়া ত্বরিতস্বরে বলিলেন, "সরোজিনি! বিনোদিনি! আমার দিকে চাও, আমি তোমাদের মা হইয়াছিলাম, মুখ দেখিয়া হয় ত বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু যে বেশে আমাকে তোমরা দেখিতে, এখন আর সে বেশে দেখিতে পাইবে না, এই বেশেই দেখিবে; কিন্তু আমাকে ভুলিও না, আমি তোমাদের সেই মা। আমাকে

তোমরা মা বলিয়াই জানিও; এখন পিতা পাইয়াছ, হাসিয়া খেলিয়া মনের সুখে আমোদ কর।”

লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি একটু ভাবিয়া গোপেশ্বরবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। বৈঠকখানায় গোপেশ্বরবাবু বলিয়াছিলেন, ডাকাতের আড্ডা হইতে মেয়ে দুটীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, মেয়েরা আট নয় বৎসর ডাকাতের সঙ্গে ছিল। ইহাদের বালিকা-জীবন কি প্রকারে সুরক্ষিত হইয়াছিল, সেই সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হইল। দৃষ্টিপাতের ভঙ্গীতেই গোপেশ্বরবাবু তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। অন্নাদি-ভক্ষণে কিরূপে মেয়েদের জাতি-রক্ষা হইয়াছে, লোকনাথের মনে সেই সন্দেহ। অনুভবেই এইটুকু বুঝিয়া গোপেশ্বরবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন,“যাহা আপনি ভাবিতেছেন, প্রথম-দর্শনে আমিও ঐরূপ ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু নানা প্রমাণে আমার সে সন্দেহ-ভঞ্জন হইয়াছে।”

লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয়াকুল-লোচনে আবার গোপেশ্বরবাবুর মুখপানে চহিলেন। গোপেশ্বরবাবু বলিলেন, “আপনি অবশ্য জানেন, আপনাদের গ্রামে যাহারা বাবু বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা ডাকাত।” পরিচয় পাইয়াছি, তাহারা আপনার জাতি। প্রথম প্রথম গ্রাম-সম্পর্ক গ্রাম-সম্পর্ক বলিয়া একজন ডাকাত বিস্তর গোলমাল করিয়াছিল, শক্ত শক্ত জেরা করিয়া শেষকালে সত্যকথা আমি বাহির করিয়া লইয়াছি। তাহারা আপনার জাতি। আপনিও জানেন, তাহারা আপনার জাতি। যাহার সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল, তাহার নাম মুরালীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ব্যক্তি ডাকাতের দলে ধর্ম্মানন্দ চট্টরাজ

নামে পরিচয় দিয়া বালিকাদের কাকা সাজিয়াছিল। সরোজিনী আমাকে বলিয়াছে, সেই ব্যক্তি রন্ধন করিয়া দিত; অপরজাতীয় অন্নব্যঞ্জন স্পর্শ করিত না।"

লোকনাথ একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পর আবার কি ভাবিলেন, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা অনেকদিন হইল দেশের জমিদারী ও ভিটামাটী বিক্রয় করিয়া পলাতক হইয়াছিল; কোথায় ছিল, নূতন জায়গায় নূতন ঘর-বাড়ী বাঁধিয়াছিল কি না, সে সমাচার আপনি কিছু জানিতে পারিয়াছেন?"

গোপেশ্বরবাবুর চিত্ত চঞ্চল হইল। তিনি ভাবিলেন, চারিদিকে চক্ষু রাখিয়া কাজ করিলেও এক একটা বিষয়েও ঠকিতে হয়। আদালতে একটা কথা উত্থাপন করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। এখনও যদি সে ভুল-সংশোধনের কোন উপায় থাকে, চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। গম্ভীর-বদনে এইরূপ চিন্তা করিয়া লোকনাথের প্রশ্নে তিনি উত্তর করিলেন, "মুখে মুখে সন্ধান পাইয়াছি; সেই মুরলীধরের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। এই বাখরগঞ্জ জেলার একটা সামান্য পল্লীগ্রামে তাহারা নূতন বাড়ী করিয়াছিল; কিন্তু সে বাড়ী কোথায় আছে, সে সন্ধান লওয়া হয় নাই।"

লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "চোর-ডাকাতেরা ত সত্যকথা বলে না। আপনার মুখে শুনিতেছি, মুরালীধর অনেক সত্যকথা বলিয়াছিল, এটা বড় আশ্চর্য্য।"

গোপেশ্বরবাবু বলিলেন, "বড় আশ্চর্য্য নয়, সত্য বলিলে আইন অনুসারে খালাস পাইতে পারে, আমি তাহাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলাম।"

সচকিতে চাহিয়া লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি মুরালীধর খালাস পাইয়াছে ?"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "সেসন-জজ কূট-প্রশ্ন ধরিয়াছিলেন। দলের মধ্যে একজন সত্যকথা বলিলে দলের সমস্ত লোক যদি ধরা পড়ে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি সত্য সাক্ষ্য দেয়, সে ব্যক্তি আইনানুসারে খালাস পায়। এখানে তাহা হয় নাই। একদিনে সমস্ত ডাকাতের সঙ্গে মুরলীধরও ধরা পড়িয়াছিল। তাহার একরারে আদালতের কোন উপকার হয় নাই, তথাপি তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করা হইয়াছে। সমস্ত ডাকাত জীবনের জন্য দায়মালে গিয়াছে, মুরলীধরের এখানকার কারাগারে সাত বৎসর মেয়াদ।"

লোকনাথ পুনরায় এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; মেয়ে দুটীকে আদর করিয়া শেষকালে তিনি বলিলেন, "আমার সকল ভাবনা দূর হইল, তোমাদিগকে পাইয়া আমি বাঁচিলাম। বাবুদের অনুমতি লইয়া একটী শুভদিন দেখিয়া আমি তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইব। যে কদিন যাওয়া না হয়, নিত্য নিত্য তোমাদিগকে দেখিব, তোমরা এইখানে থাক, আমি শুনিয়াছি, এখানে তোমাদের কোন কষ্ট নাই, বাবুদের পরিবারের সকলেই তোমাদিগকে ভালবাসেন।"

এই পর্য্যন্ত কথা। পরিচারিকার সঙ্গে বালিকারা অন্তঃপুরে গেল গোপেশ্বরবাবুর সঙ্গে লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন।

মহানন্দবাবু তৎপূর্ব্বেই বৈঠকখানায় আসিয়াছিলেন, উভয় সহোদরে কথোপকথন হইতেছিল, মুৎসুদ্দী তাঁহাদিগকে

চিনিয়াছে, মুস্তফীও একটু তফাতে বসিয়া, থাকিয়া থাকিয়া কর্ণ-সঞ্চালন করিতেছিল। লোকনাথের সহিত গোপেশ্বরবাবু পুনঃ-প্রবেশ করিলে মহানন্দবাবু প্রসন্নবদনে লোকনাথকে কহিলেন, "মহাশয়ের দুর্ভাবনা দূর হইল, হারাধন প্রাপ্ত হইলেন, আমরা সকলেই সুখী হইলাম। মেয়ে দুটী অতি সুশীলা, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। উহাদিগকে আমি এখন স্থানান্তরে যাইতে দিব না, আপনিও কিছুদিন এইখানে থাকুন, আমরা সকলেই আপনার সেবা-যত্ন করিব। কয়েক দিনের পরিচয়ে আমি বুঝিয়াছি, আপনি সুপণ্ডিত। যদি ইচ্ছা হয়, আপনি আমাদের সভাপণ্ডিতের পদ পরিগ্রহ করিতে পারেন।"

সম্মতি কি অসম্মতি কিছুই বিজ্ঞাপন না করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন, তাহার পর কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, "আমার সংসার –"

অভিপ্রায় বুঝিয়া মহানন্দবাবু কহিলেন, "সংসারের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। যাহাদিগকে লইয়া আপনার সংসার, তাহারাও এইখানে। তবে আর কাহার জন্য ভাবেন? বাড়ীতে আপনার একটী ভগ্নী আর দুটী ভাগিনেয়। তাহাদের খরচ-পত্র যাহাতে চলে, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব, কল্যই আপনি ডাকযোগে পত্র লিখুন। একমাসের খরচ পাঠাইয়া দিন। তাহার পর মাসে মাসে কুড়ি টাকা করিয়া পাঠাইবেন। আপনার সহিত আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না, পরিচয়ও জানিতাম না, বিধির ঘটনায় যখন এই শুভ সংযোগ ঘটিয়াছে, তখন আর আপনাকে ছাড়িয়া দিতে আমার ইচ্ছা নাই। নিজের বাড়ী মনে করিয়া স্বচ্ছন্দে আপনি এই

বাড়ীতে বাস করুন্। আপনাকে আমরা গুরুর আদরে রাখিব।"

গোপেশ্বরবাবুও ঐরূপ অনুরোধ করিলেন। তিনি নিজে কোথায় থাকিবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না, তথাপি মধ্যে মধ্যে আসিবেন, বাবুদের কাছে এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। মেয়েদুটীর সম্বন্ধে মহানন্দবাবুর সহিত পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ পরামর্শ হইয়াছিল, সেই পরামর্শ সিদ্ধ করা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত। এই কারণেই লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে রাখা তাঁহার খাকিঞ্চন।

সংসারে যাঁহারা পোষ্য,তাহাদের ভরণ-পোষণ চলিবে, এইরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে বাবুদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন, সেই বাড়ীতেই তিনি রহিলেন। নিত্য নিত্য মেয়েদুটীর সঙ্গে দেখা হয়, অনেক প্রকার কথা হয়, মনের সুখেই থাকেন; পিতৃ-স্নেহ অদর্শনে একপ্রকার ঘুমাইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিল।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

আষাঢ়মাস শেষ হইল। শ্রাবণমাসে ঝুলনযাত্রা, ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী। বাবুদের বাড়ীতে নিয়মমত উৎসব হইল। আশ্বিনমাস সমাগত। শারদীয়া মহামায়ার আগমন। বাবুদের বাড়ীতে নবম্যাদি কল্প। নবমী হইতে দ্বিতীয় নবমী পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবস

নিত্য মহোৎসব। পূজার তিন দিন অসংখ্য লোক পরিতোষ-রূপে ভোজন করিল, রজনীযোগে নৃত্যগীত হইল, দশমীতে বিসর্জ্জন। লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জেলার লোক। হুগলী জেলা রাজধানীর নিকটবর্ত্তী। বাঙ্গালদেশে বাঙালবাবু-দের বাড়ীতে যেরূপ সমারোহে দুর্গোৎসব হইল; হুগলী জেলার দুর্গোৎসবে তেমন ঘটা তিনি কখনও দর্শন করেন নাই।

কার্ত্তিকমাসে লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা সমস্তই বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, সে বৎসর অগ্রহায়ণমাসের প্রথমেই কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। বাড়ীর বাহিরে বৃহৎ সুগঠিত রাসমঞ্চ, সেই রাসমঞ্চ পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইল। রথযাত্রার সময় যত ঘটা হইয়াছিল, রাসযাত্রায় তাহার দ্বিগুণ ঘটা। নৃত্যগীত, আমোদ-কৌতুক, তামাসা, হরিসংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল।

রাসযাত্রার পর অগ্রহায়ণমাসে আর কোন উৎসব ছিল না; পৌষমাসেও বিশেষ কোন কার্য্য হইল না। মাঘমাস সমাগত। মহানন্দবাবু একদিন লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৈঠকখানায় আহ্বান করিয়া সাংসারিক অনেক কথা তুলিলেন। গোপেশ্বর-বাবু রাসের পর কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বে বরিশালে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, মহানন্দবাবুর সহিত লোক-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্জ্জন আলাপের সময় তিনিও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় লোকনাথকে তিনি কহিলেন, "আপনার কন্যাদুটী বিবাহের যোগ্য হইয়াছে। যোগ্য বলিতেছি, বাস্তবিক বঙ্গের হিন্দুগৃহে সচরাচর যে বয়সে কন্যার বিবাহ হয়,

আপনার কন্যাদুটীর সে বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে। আর এখন অবিবাহিত রাখা সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য।"

লোকনাথ কহিলেন, "কন্যাই ছিল না, বিবাহের ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? বিধাতার ইচ্ছায় আপনার অনুগ্রহে কন্যাদুটী আমি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, এইবার দেশে গিয়া ঘর-বর সন্ধান করিয়া বিবাহ দিবার চেষ্টা করিব।"

সূত্রপ্রাপ্ত হইয়া মহানন্দবাবু লোকনাথের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ পরিচয় দিলেন। মনে মনে আনন্দিত হইয়া মহানন্দবাবু কহিলেন, "আমাদের বংশের সহিত আপনাদের করণ-কারণ ছিল, আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি নিজ বংশবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

গোপেশ্বরবাবু বরিশালের কাছারীতে বড়বাবুর মুখে শুনিয়া একটু আভাস পাইয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি বলিলেন, "উত্তম সুযোগ হইয়াছে, এই ঘরেই আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন্। এই বাড়ীতেই দুটী পাত্র আছেন, সকল বিষয়েই উপযুক্ত, আপনার কন্যারা রাজরাণীর মত সুখে থাকিতে পারিবে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া লোকনাথ কহিলেন, "সঙ্গতি থাকিলে কুলীন-পাত্রে কন্যাদান করা আমাদের বংশের রীতি; অর্থের অভাব হইলে অন্য ঘরেও দেওয়া হয়। আমরা কুলীনের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু কুলীন-পুত্রকে জামাতা করিতে আমাদের আনন্দ হয়। লোকে আমাদিগকে চতুঃসাগরী বলে; কেন না, আমরা চারি মেলেই কন্যাদান করিতে পারি।"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "এই বাবুদের বংশপরিচয় প্রাপ্ত হইয়াও কেন আপনি অমন কথা বলিতেছেন? আপনাদের মেল আর বাবুদের মেল এক; বিশেষতঃ বাবুরা অকুলীন নহেন; ইঁহাদের ঘরে কন্যাদান করিলে আপনার মর্য্যাদার হানি হইবে না। আমি বুঝিতেছি, করণীয় ঘর। আমার অপেক্ষা আপনি বিজ্ঞ, জাতিকুল-সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা অধিক, আপনিই বিবেচনা করুন্।"

হর্ষ প্রকাশ করিয়া লোকনাথ বলিলেন, "বিবেচনা করিয়াই আমি কথা কহিতেছিলাম। করণীয় ঘর, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আপনি আমার কন্যা দুটীকে উদ্ধার করিয়াছেন, বাবুরা সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন, আপনার অনুরোধ অবশ্য পালনীয়। বাবুরা যদি অকুলীনও হইতেন, তাহা হইলেও এই ঘরে কন্যাদান করিতে আমার অমত হইত না।"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "অমত হইত না, একটু খেঁাচের কথা, স্পষ্ট করিয়া বলুন, আপনার সম্মতি আছে।" লোকনাথ বলিলেন, "আপনার বাক্যে আমি প্রতিধ্বনি করিতেছি।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহানন্দবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদানন্দবাবু অবিবাহিত; তাঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার দুটী পুত্র আছে, তাহাদের মধ্যে একটী বিবাহের যোগ্য। সেই দুই পাত্রে কন্যাদান করাই লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। পরদিন পাত্র দুটীকে তিনি দর্শন করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন, সেই দিনেই পঞ্জিকা দর্শন করিয়া শুভ-বিবাহের দিন স্থির করা হইল। লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দশকর্ম্মান্বিত সুপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য। বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য অন্য ভট্টাচার্য্যের আহ্বানে

আবশ্যক হইল না, তথাপি বাবুদের কুলপুরোহিতকে সংবাদ দেওয়া হইল, তিনি আগমন করিলেন, সকল কথা শুনিলেন, দিনটী নিখুঁত হইয়াছে, এইরূপ অভিপ্রায় দিলেন, মাঘমাসেই বিবাহ। ২৪শে মাঘ শনিবার শুভদিন।

প্রতিবৎসর মাঘমাসে বাবুদের পরিবারের একজন করিয়া জমিদারীতে যান। সে বৎসর সেটী রহিত হইল। বিবাহের পর ফাল্গুনমাসের প্রথমে মহানন্দবাবু বরিশালের কাছারীতে যাইবেন, এইরূপ ঠিক হইয়া রহিল। শ্রীপঞ্চমীর দিন বাবুদের বাড়ীতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিমাপূজা হয়, বার্ষিক পদ্ধতিতে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ২৪ শে মাঘ শুভ-বিবাহ।

বিবাহের আয়োজনে অধিক বিলম্ব হইল না; নির্দ্দিষ্ট দিবসে সরোজিনীর সহিত সদানন্দবাবুর এবং বিনোদিনীর সহিত নিত্যানন্দবাবুর বিবাহ হইল। উভয় বিবাহেই যতদূর সমারোহ হইবার, তাহার কোন অঙ্গ বাকী থাকিল না।

লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিন্ত হইলেন; বাবুদের অনুরোধে তাঁহাদের সভাপণ্ডিত হইয়া সেই বাড়ীতে রহিলেন। ফাল্গুনমাসে মহানন্দবাবু জমিদারীতে গেলেন, বৈশাখমাসে ফিরিয়া আসিলেন, এই দুই মাস গোপেশ্বরবাবুর একটী নূতন কার্য্য। একরার করিবার সময় মুরলীধর বলিয়াছিল, হুগলীর বাসত্যাগ করিয়া তাহারা বরিশালের একটী ক্ষুদ্র গ্রামে বাড়ী করিয়াছে। সে বাড়ী কোথায়, অনেক অনুসন্ধান করিয়া গোপেশ্বরবাবু তাহা বাহির করিলেন। বাড়ীতে কোন পুরুষ আছে কি না, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। স্ত্রীলোক আছে নিশ্চয়। স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করিতে হইলে স্ত্রীলোক সাজিয়া যাওয়াই

যুক্তিসিদ্ধ, এই বিবেচনা করিয়া গোপেশ্বরবাবু সেইখানে পুনরায় সুরধুনী সাজিলেন।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপেশ্বরবাবু যখন ডাকাতের বাড়ীর সন্ধান লইয়াছিলেন, গ্রামের কেহই তখন ডাকাতের কথা বলে নাই। বাড়ীর কর্ত্তারা ডাকাতী করিত, গ্রামস্থ লোকেরা তাহা জানিতই না; গোপেশ্বরবাবুও ডাকাতের নাম-গন্ধ করেন নাই। হুগলী হইতে উঠিয়া আসিয়া কাহারা এই গ্রামে বাস করিয়াছে, তাহাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গ্রাম্য লোকেরা উত্তর দিয়াছিল, নয়দা বামন। এক এক স্থানের লোকে নূতনকে নয়দা বলে। সে গ্রামের লোকেরা ডাকাতের দলকে নূতন ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিত। গোপেশ্বরবাবুকে তাহারা সেই বাড়ী দেখাইয়া দিয়াছিল। সুরধুনী সাজিয়া গোপেশ্বর-বাবু সেই বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন;—দেখিলেন, চারি পাঁচটী বালক সেই বাড়ীর ভিতর খেলা করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-বালিকা। সুরধুনী তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে কে থাকে?" উত্তর পাইলেন, বাবুরা নাই, আমাদের মা আছে।

বালক-বালিকাদের মধ্যে যেটী বড়, সেইটীকে সঙ্গে লইয়া সুরধুনী দেবী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ী দুই মহল। সদর-মহল মাটীর প্রাচীরে ঘেরা, ভিতরে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ, দক্ষিণধারে বড় একখানা চালাঘর, তাহার একদিকে গরু থাকে, একদিকে জ্বালানীকাঠ, ঘুঁটে আর নানা প্রকার আবর্জ্জনা। অন্দর-মহলে ৬।৭ খানা মাটীর ঘর, প্রশস্ত উঠান, একধারে গুটী দুই তুলসীবৃক্ষ। সুরধুনী দেবী একখানি ঘরের বারাণ্ডায় গিয়া

উঠিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গৃহ হইতে তিনটী স্ত্রীলোক বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। তিনটীই বধূ। গাত্রে সামান্য সামান্য অলঙ্কার; কিন্তু কাহারও ঘোম্‌টা ছিল না। নূতন স্ত্রীলোক দেখিয়া একটী বড়বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা? কোথা থেকে আস্‌ছ? কাকে খোঁজো? কোথা তোমার বাড়ী?" কথা শুনিয়া সুরধুনী বুঝিলেন, এই বাড়ীই ঠিক। বাঙাল-দেশের ভাষা শুনিলেন না, কলিকাতা অঞ্চলের পরিষ্কার ভাষাতেই স্ত্রীলোকটী কথা কহিলেন। সুরধুনী দেবী সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন, "কলিকাতাতেই আমি থাকি, আমার আত্মীয়-লোকেরা এই দেশে আসিতেছিলেন, এই গ্রামের নিকটে তাঁহাদিগকে ডাকাতে ধরিয়াছিল, আমি পলাইয়া আসিয়াছি, কোথায় আশ্রয় পাইব, খুঁজিতে খুঁজিতে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

ডাকাতে ধরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া তিনটী স্ত্রীলোক অল্প অল্প কাঁপিয়া উঠিলেন, হঠাৎ তাঁহাদের মুখ শুকাইল। যে সকল বালক-বালিকা বাহির-বাড়ীতে খেলা করিতেছিল, তাহারা সেই সময় সেইখানে আসিয়া জুটিল। সুরধুনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগুলি কি তোমাদের ছেলে?"

যে স্ত্রীলোকটী অগ্রে কথা কহিতেছিলেন, তিনি উত্তর করি-লেন, "আমাদেরই ছেলে। আমরা এখন এই বাড়ীতে পাঁচটী স্ত্রীলোক আছি। ঐ ছেলে-মেয়েগুলিকে প্রতিপালন করিতেছি।"

সুরধুনী কহিলেন, "কেন? ছেলে-মেয়েগুলিকে লইয়া কেবল তোমরাই আছ কেন, বাড়ীর পুরুষেরা কোথায় গেলেন?"

স্ত্রীলোকটী উত্তর করিলেন, "তাঁহারা কে কোথায় গিয়াছেন,

অনেকদিন খবর পাই নাই।" কথা কহিবার সময় সেই স্ত্রী-লোকটীর চক্ষের কোণে একটু একটু জল দেখা দিল।

সুরধুনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গা, তুমি কাঁদ কেন? তাঁহারা কি কোথাও চাকরী করিতে গিয়াছেন?"

স্ত্রীলোক কথা কহিলেন না। তাঁহার চক্ষের জল মুখে গড়াইয়া টপ্ টপ্ করিয়া বক্ষে পড়িল। অপর দুটী স্ত্রীলোকও অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

সুরধুনী বলিলেন, "তোমরা তিন জনেই কাঁদিতেছ। কি হইয়াছে, আমার সাক্ষাতে বলিতে পার না? পুরুষেরা বাড়ীতে নাই, তোমাদের সংসার চলিতেছে কিরূপে? এখানে তোমাদের বিষয়-আশয় আছে?"

যে স্ত্রীলোকটী কথা কহিতেছিলেন, চক্ষের জল মুছিয়া তিনি কহিলেন, "আমরা এদেশে নুতন আসিয়াছিলাম। বিষয়-আশয় কিছুই নাই। তাঁহারা টাকা আনিতেন, তাহাতেই চলিত। যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্তই ফুরাইয়া আসিল। ইহার পর কিরূপে চলিবে, তাহাই ভাবিয়া আমরা যেন অগাধ জলে পড়িয়াছি। তাঁহাদের কোন খবর পাইতেছি না।"

সুরধুনী কহিলেন, "এ অঞ্চলে অত্যন্ত ডাকাতের ভয়। তাঁহাদিগকে হয় ত ডাকাতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি যদি তোমাদের ভাল একটা আশ্রয় দেখাইয়া দিতে পারি, সেখানে কি তোমরা যাইতে চাও?"

সেই সময় আর দুটী বধূ সেইখানে আসিলেন। পাঁচজনেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "ডাকাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া কি করে?"

সুরধুনী বলিলেন, "দলে মিশাইয়া ডাকাত করে। আমি শুনিয়াছি, গত বৎসর একদল ডাকাত ধরা পড়িয়াছিল, তাহারা সকলেই দায়মালে গিয়াছে। তাদের সঙ্গে যদি তোমাদের বাড়ীর পুরুষেরা—"

স্ত্রীলোকেরা কাঁদিয়া অধীরা হইলেন। সুরধুনী বলিলেন, এখনি তোমরা কাঁদ কেন? কি হইয়াছে, এখন ত ঠিক জানা যাইতেছে না, আমার বোধ হয়, ডাকাতেরা তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পুষিয়াছিল; তাহার পরেও তাহারা এ বাড়ীতে আসিয়াছিল। বাড়ীতে হয় ত অনেক টাকা আছে। এইখানে তাহাদের বাড়ী, পুলিস যদি এ কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে তোমাদের বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইবে। খানাতল্লাসী কাকে বলে, তা জানো? তোমাদের ঘরে কিম্বা বাড়ীর কোন স্থানে চোরামাল আছে কি না, পুলিস আসিয়া তাহার সন্ধান করিবে; তোমাদেরও বিপদ্ ঘটিতে পারে। অনেক দিনের কথা, পুলিস কিছুই জানে না, সেই জন্য খানাতল্লালী হয় নাই। তোমাদের সংসারে কষ্ট হইয়াছে,—হাঁ, তোমাদের এই গ্রামখানার জমিদার কে? তা তোমরা জানো?"

কম্পিতস্বরে বড়বধূ বলিলেন, "শুনেছি, মহানন্দ মহাপাত্র।"

একটু যেন চমকিত হইয়া সুরধুনী বলিলেন, "ওহো হো, তবে তোমাদের কোন ভাবনা নাই। আমি ব্রাহ্মণের কন্যা। যাঁহাদের সঙ্গে আমি এখানে আসিতেছিলাম, তাঁহারা সেই মহানন্দবাবুর বাড়ীতেই যাইতেন। তাঁহারা খুব ভাললোক, পুলিস তাঁহাদের বাধ্য। পুলিস কোন প্রকার গোলযোগ করিতে না পারে, আমি যদি কোন প্রকারে মহানন্দবাবুর বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিতে

পারি, তিনি আমাদের কুটুম্ব হন, আমি সেখানে উপস্থিত হইলে মেয়ে-মহলে তোমাদের দুর্দ্দশার কথা জানাইব, বাবুরা শুনিবেন, তোমাদের কিনারা হইবে।”

বড়বধূ কহিলেন, “তুমি আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছিলে; আজ কি তবে তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকিবে না?”

সুরধুনী বলিলেন, “বেলা অনেক আছে, তোমাদের কষ্টের সংসার, দুঃখের সংসার, এখানে থাকিয়া আমি আরও তোমাদের কষ্ট বাড়াইব। দেখি দেখি, নিকটে যদি পাল্কী পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি তোমাদের জমিদারের বাড়ীতেই চলিয়া যাইব।”

এই বলিয়াই সুরধুনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। থাকিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা বিস্তর অনুরোধ করিলেন, তিনি থাকিলেন না।

ষোড়শ কাণ্ড।

ডাকাতের বাড়ী-দর্শনের তিন দিন পরে গোপেশ্বরবাবু জমিদার-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; মহানন্দবাবু জমিদারী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের ভ্রমণ-বিষয়ক সকল কথা বলিলেন, ডাকাতের বাড়ী-সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তাহা শ্রবণ করিয়া মহানন্দবাবু সম্মতিপ্রদান করিলেন। কয়েকদিন পরে প্রায় পঞ্চাশজন খনক সমাভিব্যাহারে গোপেশ্বরবাবু সেই ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন। জমিদারের হুকুমে কার্য্য হইবে, পুলিসের সহায়তা আবশ্যক হইবে না। বাড়ীর স্ত্রীলোকগণকে সরাইয়া দিয়া তাহাদের সমস্ত ঘর ও বাড়ীর মধ্যস্থ

সমস্ত স্থান খনন করাইয়া গোপেশ্বরবাবু দেখিলেন, কোন জিনিস পাওয়া গেল না। চোর-ডাকাতের টাকা বাতাসে বাতাসে উড়িয়া যায়, তাহাই হইয়াছে, কিম্বা ডাকাতেরা আর কোথাও পুঁতিয়া রাখিয়াছে, সমস্তই মাটী হইয়া যাইবে, কিম্বা ভবিষ্যতে যদি কাহারও ভাগ্যে থাকে, তাহারা পাইবে, ইহা ভিন্ন আর কোন সিদ্ধান্ত আসিল না। যে সকল স্থান খনন করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববৎ সমান করিয়া দিয়া লোকজন সমভিব্যাহারে গোপেশ্বরবাবু হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আবার এক-পক্ষ পরে নারীবেশে সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বধূগুলিকে নিকটে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "তোমাদের স্বামী-গণের ভাগ্যে যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। জমিদার-বাড়ীতে আমি গিয়াছিলাম। তোমাদের বাড়ীতে গুপ্তধন পোঁতা আছে কি না, জমিদার মহাশয়ের লোকেরা তাহা সন্ধান করিতে আসিয়াছিল, তাহা তোমরা জানো। লোকেরা কিছুই বাহির করিতে পারে নাই। আমি তোমাদের অনেকটা উপকার করিয়াছি। মহানন্দবাবু ধার্ম্মিকলোক। তোমাদের দুঃখের কথা তাঁহাকে আমি জানাইয়াছিলাম। তিনি তোমাদের আর তোমাদের নাবালক সন্তানগণের নাম জানিতে চাহিয়াছেন। তোমাদের এই বাড়ীর খাজনা তিনি লইবেন না। আর এই গ্রামের একশত বিঘা শালীজমি তোমাদের নামে নিষ্কর করিয়া দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। তোমাদের নাম বল? আমি লিখিতে জানি। কোন প্রতিবাসীর বাড়ী হইতে কালী-কলম-কাগজ আনিয়া দাও, নামগুলি আমি লিখিয়া লইয়া যাই। আমার সঙ্গে পাল্কী আছে, আজই আমি চলিয়া যাইব, একমাসের

মধ্যে তোমাদের নামে সনন্দ আসিবে। তোমাদের ভরণ-পোষণের কোন কষ্ট হইবে না। এখানকার নায়েবের নামেও তোমাদের নিকর সম্বন্ধে বাবুমহাশয় হুকুমনামা পাঠাইবেন।"

স্ত্রীলোকেরা বাবুর নামে আশীর্ব্বাদ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন; একটী বালক পাঠাইয়া এক প্রতিবাসীর বাটী হইতে দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিয়া আনাইলেন; যে নামগুলি বলা আবশ্যক, একে একে সেই নামগুলি বলিলেন, সুরধুনী দেবী লিখিয়া লইলেন। অতঃপর রমণীগণকে অনেক বুঝাইয়া পঞ্চাশটী টাকা নগদ দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিবিকা আরোহণে তিনি বিদায় হইলেন।

আবার এক পক্ষ অতীত। ডাকাত-গ্রেপ্তারের সময় যে দারোগাটী গতিবিধি করিয়াছিলেন, তিনি ভদ্রলোক। মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে একখানি রিপোর্ট করিয়া তিনি জানাইয়াছিলেন, বরিশালের জমিদারী কাছারীর ডাকাতী মকদ্দমায় গোপেশ্বর ঘোষাল নামক একজন ভদ্রলোক বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন; ডাকাত ধরিবার মূল তিনি; তাঁহাকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহা অবগত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহানন্দবাবুকে এক পত্র লিখিয়াছেন, "বাবু গোপেশ্বর ঘোষাল নামে যে ভদ্রলোকটী আপনাদের বাড়ীতে আছেন, তাঁহাকে অনুরোধ করিবেন, তিনি যেন অবকাশক্রমে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমার খাস-কামরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

মহানন্দবাবু সেই পত্র গোপেশ্বরবাবুকে দেখাইয়া আদেশ-মত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। গোপেশ্বরবাবু সদর

ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের খাস-কামরায় সাক্ষাৎ করিলেন। সমাদর করিয়া বসাইয়া মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বলিলেন, "দারোগার রিপোর্টে আমি আপনার দক্ষতার বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আপনি এখানকার পুলিসে একটী উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া পুলিস-কর্ম্মচারিগণের সাহায্য করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব।"

ধন্যবাদ দিয়া, অস্বীকার করিয়া, গোপেশ্বরবাবু বলিলেন, "হুজুরের অনুগ্রহই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। স্বদেশে আমার জমিদারী আছে, তাহা রক্ষণাবেক্ষণে সর্ব্বদা আমাকে লিপ্ত থাকিতে হয়; অবকাশ অতি অল্প, অতএব আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব দুঃখিত হইলেন। গোপেশ্বরবাবু তাঁহাকে সেলাম করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মহানন্দবাবুর সহিত গোপেশ্বরবাবুর নূতন কথা। মহানন্দবাবু কহিলেন, "আপনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুরোধে অস্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে আমি একটী অনুরোধ করি, সেটী যদি রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কাছে চিরজীবন বাধিত হইয়া থাকিব।"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "আপনার সদ্ব্যবহারে আমি আপনার কাছে বাধা আছি। আমার অসাধ্য না হইলে অবশ্যই আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব। কি অনুরোধ, আজ্ঞা করুন!"

মহানন্দবাবু কহিলেন, "আপনি আমার অকারণ মিত্র, আপনার গুণে আমি একান্ত বশীভূত। মিত্রতার সহিত কুটুম্বিতার যোগ হইলে বড় সুখের বিষয় হয়। আপনার বয়স কিছু অধিক হয় নাই; এই বয়সে স্ত্রী-বিয়োগ বড় কষ্টের কারণ, অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি পুনরায় দারপরি-

গ্রহণ করুন! আমার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার একটী কন্যা আছে, তাহা আপনাকে বলিয়াছি। কন্যাটীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। আপনি এঁড়েদহের ঘোষাল। আপনাদের ঘরে কন্যাদান করিতে আমাদের কোন বাধাই নাই। কন্যাটী সুন্দরী, দেখিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন। আপনি সেই কন্যাটীর পাণিগ্রহণ করুন।"

গোপেশ্বরবাবু কহিলেন, "আপনার অনুরোধে উপেক্ষা করা আমার অনুচিত কার্য্য; কিন্তু আমার পুত্র আছে। পুত্রের জন্যই বিবাহ করা। ভগবান্ আমাকে একটী পুত্র দিয়াছেন. দ্বিতীয়বার বন্ধনে যাইতে আর আমার ইচ্ছা নাই।"

মহানন্দবাবু আরও দুই তিনবার অনুরোধ করিলেন, অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, বিস্তর কথা-কাটাকাটি হইল, শেষকালে হাতে ধরিয়া মহানন্দবাবু অনেক মিনতি করিলেন, গোপেশ্বরবাবু আর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

মৌনে সম্মতিপ্রকাশ পায়, ইহাই বুঝিয়া মহানন্দবাবু সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর নাম সারদাসুন্দরী। পরদিন সারদাসুন্দরীকে অলঙ্কার-বস্ত্র পরাইয়া গোপেশ্বরবাবুর সম্মুখে আনয়ন করা হইল। সারদাসুন্দরী পরম-রূপবতী, বিবাহ করিতে গোপেশ্বরবাবুর মন হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে সারদাসুন্দরীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিংশুক সারদাসুন্দরীকে 'ও মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুদের বাড়ীর সভাপণ্ডিত হইয়াছেন, তিনি আর দেশে যাইতে অবকাশ পান না, দেশের আয়ও তাঁহার অল্প। মহানন্দবাবু তাঁহার জন্য একখানি স্বতন্ত্র বাড়ী করিয়া দিলেন; হুগলীর বাড়ী অপর একজন দরিদ্র

ব্রাহ্মণকে দান করাইয়া সদাশয় মহানন্দবাবু সভাপণ্ডিতের ও ভাগিনেয় দুটীকে বরিশালে আনাইলেন। ভাগিনেয়ঃ কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিল, জমিদারী সেরেস্তাঃ দশ দশ টাকা বেতনে তাহাদের চাকরী হইল। লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুখী হইলেন, সংসারের ভাবনা গেল, অমুদ্দিষ্টা কন্যা দুটীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সৎপাত্রে দান করিয়াছেন, নিত্য নিত্য তাহাদিগকে দেখিতে পান, মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন পান, মনে আর কোন অসুখ থাকিল না।

গোপেশ্বরবাবু জমীদার। তাঁহাকে নিজগ্রামে বাস করাইতে মহানন্দবাবু প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, ছয় মাস পরে একদিন তাঁহাকে কহিলেন, "বড়লোকের যেমন বাগানবাড়ী থাকে, আপনি এখানে সেইরূপ একখানা বাগানবাড়ী লইয়া বাস করিলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। আমার বাগানে সুন্দর অট্টালিকা আছে, সেইখানে আপনি থাকুন। আপনার দেশের বাড়ীতে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা বিষয়কর্ম্ম দেখি বৎসরের মধ্যে দুইবার আপনি গিয়া বাড়ীর কার্য্য ও দারীর কার্য্য দেখিয়া আসিবেন, কিছুই অসুবিধা হইবে না।"

বাবুদের সঙ্গে গোপেশ্বরবাবুর বন্ধুত্ব হইয়াছিল, কুটুম্বি হইয়াছিল, সেই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন। বাবুদের উদ্যানের মনোহর অট্টালিকায় তিনি বাস করিলেন। জীবনসহচ সারদাসুন্দরী, স্নেহভাজন পুত্র কিংশুককুমার, নিত্য-সহচ প্রভুভক্ত মুস্তফী। আবশ্যকমত দাস-দাসী ও পাচিকা ব্রাহ্ম নিযুক্ত হইল। তিনি সেখানে মনের সুখে রহিলেন।

পরিশিষ্ট।

"বাবু-চোরের" উপাখ্যান এইখানে সমাপ্ত। যখনকার এই ঘটনা, তখন বঙ্গদেশে—এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষে ডিটেক্‌টিভ পুলিসের নাম ছিল না। গোপেশ্বরবাবু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের আদর্শ দেখাইলেন। সে সময় হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় বিস্তর বদ্‌মাসলোক ছিল, দেশের মধ্যে প্রায়ই ডাকাতী হইত। বড় বড় মাঠে, বিজন পুষ্করিণীর ধারে লাঠিবাজি করিয়া দুর্দ্দান্ত ঠেঙ্গাড়েরা উষাকালে, সন্ধ্যাকালে, দিবা দ্বিপ্রহরে বিস্তর মানুষ মারিত। পথিক লোকের সঙ্গে মূল্যবান্ সামগ্রী না থাকিলেও ঠেঙ্গাড়েরা একখানি বস্ত্র অথবা গামছার লোভে নরহত্যা করিত। অন্ধকারে আত্মীয়-কুটুম্ব বিবেচনা করিত না। একজন একবার আপনার জামাতাকে ঐরূপে খুন করিয়া কন্যাকে বিধবা করিয়াছিল। প্রতাপশালী ইংরাজ কোম্পানীর আমলে ঐ প্রকার উপদ্রবও ক্রমাগত বহুদিন মহা কলঙ্কের হেতু হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ প্রকার উপদ্রব নিবারণের বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহার পর ঠগী কমিশনরী সৃষ্টি। ওয়াকব সাহেব প্রথম ঠগী কমিশনার। সেই আমলে অনেক চোর-ডাকাত জব্দ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও বাবু-চোর বাবু-ডাকাতের অভাব ছিল না। ঠগী কমিশনরীর ফলে বঙ্গদেশের গৃহস্থগণের অনেক প্রকার সুমঙ্গল হইয়াছিল, সুফল দর্শনে ক্রমে ক্রমে ডিটেক্‌টিভ পুলিসের প্রবর্ত্তন হয়। ডিটেক্‌টিভেরা

থানার দারোগাদের অপেক্ষা অধিক যোগ্যতা দেখাই[illegible] থাকেন। বর্ত্তমান সময়ের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টরেরাও দক্ষত[illegible] সহিত কার্য্য করিতেছেন। সকলে সমান নহেন, ইহা অব[illegible] স্বীকার্য্য। মার্কিণ, ফরাসী, ইংরাজী ডিটেক্‌টিভেরা অসী[illegible] সাহসিকতা দেখাইতে পারেন না; তথাপি বঙ্গদেশের এক এক জন বাঙ্গালী ডিটেক্‌টিভ বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দেন। শোভাবাজারের বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র সবিশেষ কার্য্যক্ষম ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টার হইয়া কয়েক বৎসর বিশে[illegible] প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বাবু অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ও সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। অধুনা বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় শনৈঃ শনৈঃ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। প্রস্তাবিত উপাখ্যানে গোপেশ্বরবাবুর যেরূপ দয়া ও বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় হইল, তাহা সমধিক প্রশংসার যোগ্য। বর্ত্তমান পুলিশের বেতনভোগী ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টারেরা গোপেশ্বরবাবুকে আদর্শ স্থলে গ্রহণ করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

সম্পূর্ণ।